প্রকাশক—
শ্রীসতীপতি ভট্টাচার্য্য,
অন্নদাবুক ষ্টল,
৭৮।২নং হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা।

গ্রন্থকারের—তুলসীদাস (যন্ত্রস্থ)

প্রিণ্টার—
শ্রীকুলচন্দ্র দে,
শাস্ত্রপ্রচার প্রেস,
৫নং ছিদামমুদির লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ-পত্র।

পরম ধার্ম্মিক ও দানশীল

বন্ধুবর—শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ মহাতো

মহোদয় করকমলে !

১৪৫ নং ডায়মণ্ড হারবার রোড, আলিপুর কলিকাতা।

প্রিয় রামনারাণ বাবু !

আপনি আমার মুখে ভক্ত-চরিত্র শ্রবণ করিতে বড়ই ভাল বাসেন। আপনার হৃদয় কোমল এবং ভক্তিতে ভরা, যখন আমি প্রাণের সহিত আপনার নিকট সাধক-চরিত্র বিবৃত করি, তখন প্রাণ গলিয়া আপনার দুই চক্ষে ধারা প্রবাহিত হয়, আপনিও কাঁদেন—আমিও কাঁদি ; আমাদের সেই অবস্থা দেখিয়া অপরে যাহা ব'লে বলুন কিন্তু সে সময়কার সুখভোগের সহিত বাস্তবিক জগতের কোন সুখের তুলনা হয় না। আপনি এই সকল ভাল বাসেন বলিয়া আজ আমার আদরের সাধক-চরিত্র "দরাফ খাঁ" আপনার পবিত্র নামে উৎসর্গ করিলাম। ইহা পাঠে আপনার ভক্তিভাব কথঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইলে, আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব।

কিমধিকমিতি

১০৮ নং পঞ্চাননতলা রোড,
হাওড়া
১লা আশ্বিন ১৩২৪ সাল

বিনীত
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।

নিবেদন

আমার সাধক জীবনীর প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থ "বামাক্ষেপা" ও "রামপ্রসাদ" পুস্তক প্রকাশিত হইয়া পাঠকগণের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে; এমন কি অনেকে বিশেষ সন্তুষ্ট চিত্তে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন জানিয়া লুব্ধ অন্তঃকরণে উহার তৃতীয় গ্রন্থ "দরাফ খাঁ" সাধারণে প্রকাশ করিলাম। সাধক প্রবর দরাফ খাঁর সম্বন্ধে কোন কিছু ইতিহাস পাওয়া যায় না; কিম্বদন্তির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়, প্রচলিত গল্প গুজবই ইহার মূলভিত্তি, তবে "দেবগণের মর্ত্তে আগমন" "নামক গ্রন্থে এবং হুগলী হইতে প্রকাশিত "পূর্ণিমা" নামক মাসিক পত্রে দরাফ খাঁর সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তি প্রকাশিত হইয়াছে, এ গ্রন্থে আমি তাহারও আশ্রয় লইয়াছি। তবে নির্দ্দিষ্ট কোন ঐতিহাসিক তত্ত্ব এ সম্বন্ধে পাওয়া যায় নাই। এই জন্য ইহার নাম, স্থান ও সময় নির্দ্ধারণের কিছু ব্যতিক্রম হইতে পারে। ভক্ত পাঠক! সেই দুষ্প্রাপ্য বিষয়ের জন্য আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া ভক্তের ন্যায় ভক্তি পূর্ণ হৃদয়ে ইহা পাঠ করিয়া আমাকে পূর্ব্বের ন্যায় কৃতার্থ করুন।

লুপ্তনাম ভক্তগণের জীবনী উদ্ধার করতঃ ভক্তিভাবে চিত্রাঙ্কিত করিয়া ভক্ত-বৃন্দের নয়নগোচর করাই আমার উদ্দেশ্য—ত্রুটী হইলে- ভক্তপ্রাণ পাঠকগণের নিকট নিশ্চয়ই ক্ষমা পাইব।

"বর্ণাশ্রমে" অনেক লুপ্ত ভক্তগণের জীবনী সাধ্যমত প্রকাশ করিয়াছি, এবং ক্ষমাময় পাঠকবর্গের নিকট তাহা সমাদৃত হওয়ায় অতি অল্পদিনের মধ্যে তাহার ৪০০০ পুস্তক নিশেষিত হইয়া তৃতীয়

সংস্করণ আরম্ভ হইয়াছে। আমার ন্যায় অকৃতিলেখকের পক্ষে ইহা কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

ভারত ভক্তের দেশ—ধর্ম্ম ইহার অধিবাসিগণের অস্থিমজ্জায় জড়িত, এই জন্য প্রত্যেক গ্রন্থ ধর্ম্মভাবে প্রণীত হইলে এখনকার পাঠকের রুচিমূলক হয়, অপর কোন দেশের লোকে ইহার যথার্থতা না বুঝিলেও আমাদের দেশের রাজা মহারাজা হইতে সামান্য কৃষক পর্য্যন্ত এই ভাবে অনুপ্রাণিত, এই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে আমাদের সকল প্রকার দুঃখ-দৈন্য দূর হয়—তখন মনে হয়—বিরাট এই বিশ্ব, মা বিশ্বেশ্বরীর একটী বিরাট মন্দির; আমরা প্রত্যহ এখানে পূজার আয়োজন করিতে, শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া দেবগৃহের সংস্কার করিতে, পুত্র-কলত্র লইয়া দেবতা-সন্তুষ্টি-সাধন করিতে ও তাঁহার সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করিতে এখানে আসিয়াছি। মহৎ হইতেও মহান ভগবানকে নিজ আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া এমন অন্তরঙ্গ করিয়া লইতে পৃথিবীর আর কোন জাতি পারিয়াছে কি? এখানে কোটী কণ্ঠে মাতৃনামগানে আত্মহারা হইয়া তাহার চরণে অর্ঘ্য স্থাপিত হয়—কেহ কিছু লিখিবার অগ্রে ভগবানের শরণাপন্ন না হইয়া কিছু লিখিয়া থাকে; কিছু বলে না, দেবতার নামে পুত্র কন্যার নাম না রাখিয়া তৃপ্ত বোধ করে না; কিছু খাইবার অগ্রে দেবতাকে অর্পণ না করিয়া আহার করে না। বিপদাপন্ন হইলে "নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ, "অথবা বিপত্তৌ মধুসূদন" বলা তাহাদের চিরাভ্যস্থ। তুমি কিছুতেই ভারতবাসীকে একত্র জড় করিতে পারিবে না—পরস্পর কত অনৈক্য, কিন্তু ধর্ম্মের নামে ভেরীরব কর দেখি, ধর্ম্মভাবের কোন অনুষ্ঠান হউক দেখি, দেখিবে দলে দলে লোক সমাগত হইতেছে। যেখানে ধর্ম্মস্রোত প্রবাহিত

সেখানে লোকের অভাব হয় না—তাই মুমূর্ষু ব্যক্তিও তীর্থে যাইয়া মরিবার সাধ করে, উত্থানশক্তিবিহীনেরও হৃদয়ে নব-শক্তির সঞ্চার হয়, তীর্থস্থানে যাইয়া মরিতে পারিলেও সে যেন আপনাকে ধন্য জ্ঞান করে। প্রকৃত ধর্ম্মকথার আলোচনা তাহাই আমাদের কর্ম্মগৌরব—ধর্ম্মপ্রসঙ্গ তাই এ দেশবাসীর এত আদরের, এত প্রাণের জিনিস আর সেই ধর্ম্ম কর্ম্মের আধারভূত সাধকজীবনী তাই এ দেশের লোকে এত আদর করে—এত আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া লেখককে কৃতার্থ করে।

আমরা পাকা গৃহস্থ হইলেও উদাসীন; সংসারের অসারত্ব উপলব্ধি করাইবার জন্য বাউলগণ দলে দলে গ্রামমধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, আমরাও শ্মশানবাসী দেবদেবীর পূজা করিয়া কৃতার্থ হই। এক দিকে শ্মশান দেখি, এক দিকে সংসার দেখি। সংসারের সত্যতা অপেক্ষা শ্মশানের সত্যতা আমাদের দৃঢ়তর। এমন কর্ম্ম কুশলতা এমন সাধনা, এমন একতা কি আর কাহার আছে?

দরাফ খাঁর জীবন এ সকলের আদর্শ স্থল। সাধ্যানুসারে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টার ক্রটী করি নাই, এক্ষণে ভক্ত পাঠকগণ ইহা পাঠে কথঞ্চিৎ সুখী হইলেও শ্রম সফল জ্ঞান করিব। সময়াভাব বশতঃ স্থানে স্থানে ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে—বারান্তরে তাহা সংশোধিত হইবে, এক্ষণে ক্রটী মার্জ্জনীয়। ইতি

১০৮ নং পঞ্চাননতলা রোড,
হাওড়া,
১লা আশ্বিন—১৩২৪। } শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সূচনা।

সাধন সৌধের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করিয়া তাহার আশ্রয়ে আশ্রয় লাভ করত মানব জন্ম সার্থক করিতে হইলে ভক্তিমার্গই যে একমাত্র সহজ এবং সুগম, আর্য্য শাস্ত্র তাহা তারস্বরে পরিকীর্ত্তন করিয়াছেন। ভক্তিবলে সাধনায় সুসিদ্ধি লাভ করিয়া ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ করা যত অনায়াস সাধ্য, যত সহজ, তত আর কিছুতেই নহে। সাধককে সাধন-মার্গের উচ্চতর শীর্ষে উন্নীত করিয়া মুক্তিপথের পথিক করিতে ভক্তির ক্ষমতা যত অধিক, ভক্তির বলে সে দুর্গম ও পিচ্ছিল পথ যত সরল ও সহজ হয়, তত আর কোন পন্থা অবলম্বনেই হইতে পারে না—ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য। এখন বেশ বুঝিতে পারা গেল—ভক্তিযোগ অভ্যাস না করিলে ভক্তবৎসলের সহিত যোগাযোগ কখনই সম্ভবপর নহে, তুমি কর্ম্মকাণ্ডে অভ্যস্থ হইয়া যতই কেন কর্ম্মবীর নামে অভিহিত হও না, অশেষ শাস্ত্র গ্রন্থ আলোড়ন করিয়া যতই কেন জ্ঞান-গরিমায়-বিমণ্ডিত হও না, ভক্তির পবিত্র ভাব সংস্পর্শ না হইলে ভগবৎ-প্রাপ্তি বিষয়ে তাহা কোন কার্য্যকরী হইবে না, তাহার দ্বারা কখনই সেই ভবারাধ্য ধন বিশ্বেশ্বরীর রাতুল চরণ লাভ করা যাইবে না।

কলির জীবের পরমায়ু অতি অল্প—শরীর সর্ব্বদা আধিব্যাধি প্রপীড়িত; অন্যান্য যুগের মত দেহ তাদৃশ সবল নহে যে কৃচ্ছ্রসাধ্য যোগ-সাধনা করিয়া সাধ্য বস্তুর দর্শন লাভে চরিতার্থ হইবে—মানবজন্ম সফল করিবে, এই কলিযুগে ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে সাধনাক্ষেত্রে

অগ্রসর হইলে জীবের আশা যে ফলবতী হইবে, ইহা অমোঘ সত্য। শুধু কলিতে কেন, সাধনমার্গে সমুত্তীর্ণ হইয়া সাধ্যবস্তু লাভ করিতে হইলে, ভক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র অবলম্বনীয়, সাধককে সহজে সেই চির আকাঙ্ক্ষিত অমৃতের সন্ধান বলিয়া দিয়া তাহার রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত করিতে, বাঞ্ছিতের চরণ তলে পৌঁছছাইয়া দিয়া তাহার তৃষিত প্রাণের পিপাসা মিটাইতে, সহজে মুক্তি পথের পথিক করিয়া সাধকের ভবব্যাধির শান্তি করিতে ভক্তির তুল্য ক্ষমতা আর কাহার নাই। এই জন্য সাধক বলিয়াছেনঃ—"সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী"! কষ্ট সাধ্য সাধনার অন্ধকারময় বন্ধুর পথ দেখিয়া মানব! তুমি ভগ্নোদ্যম হইও না, হতাশ বিষাদে হাল্ ছাড়িয়া দিয়া এ দুর্লভ মানবজন্মকে বৃথায় অতিবাহিত হইতে দিও না। প্রেম-ভক্তির বর্ত্তিকা হাতে লইয়া অগ্রসর হও; হৃদয় বিশ্বাস-বর্ম্মে আচ্ছাদিত কর, দেখিবে— তোমার সকল বাধা-বিঘ্ন ঘুচিয়া যাইবে, মরুময় জীবনে শান্তির অমিয় মন্দাকিনী প্রবাহিত হইয়া তোমার সকল জ্বালা, সকল যন্ত্রণা নির্ব্বাণ করিয়া দিবে—তুমি চিরতরে ধন্য হইয়া যাইবে এস কর্ম্মণ্য অকর্ম্মণ্য ব্যথিত, অবসাদ গ্রস্থ জীব! তোমার সম্মুখে ভক্তির স্নিগ্ধ-করোজ্বল প্রশস্ত পথ সুবিস্তৃত, বিশ্বাস-বর্ম্মে দেহ আবরিত করিয়া মাতৃ নাম মহামন্ত্র জপ করিতে করিতে অগ্রসর হও, দেখিবে মাতৃক্রোড় তোমার অতি নিকটে।

অক্ষম-অজ্ঞান বলিয়া ভয় করিতে হইবে না; হীনজাতি হীনকর্ম্মী বলিয়া তোমার সঙ্কোচ বোধ করিবার আবশ্যক নাই। ভক্তিবল মহাবল, সাধন ক্ষেত্রে ইহার সমকক্ষ আর কিছুই নাই, তুমি যে জাতিই হও, যেরূপ অল্প জ্ঞানে তুমি জ্ঞানবান হও, কর্ম্মকাণ্ডে যতই তুমি অনভিজ্ঞ হও ভক্তিবল প্রবল করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলে, তোমার কোন

বাধাই ঠেকিবে না, কেহই তোমার অপ্রতিহত গতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে না ; তাই শাস্ত্র বলিতেছেন :—

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ ।
হরিভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥

অতএব ভক্তিভাব দৃঢ় করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতে পারিলে তোমার আর কিছুরই অভাব হইবে না। ভক্তি ভিন্ন সাধনা হয় না, সাধ্যবস্তু লাভ করিতে হইলে এক ভক্তি ভিন্ন অন্য উপায় নাই ; এই ভক্তি বলেই মহারাজ বলী ত্রিলোকের কর্ত্তা ভগবানকে দ্বারের দ্বারী করিতে পারিয়াছিলেন—এই ভক্তিবলেই ধ্রুব প্রহ্লাদ একদিন তাঁহাকে ক্রীড়ার পুত্তলী করত কত অসাধ্য সাধন করিয়া লইয়াছিলেন। একমাত্র প্রবল ভক্তির বলেই চণ্ডালরাজ গুহককে ভগবান শ্রীরাম চন্দ্র আলিঙ্গন দান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন। এক ভক্তির বলেই শ্রীবৃন্দাবনে গোপবালকগণ ভগবান রামকৃষ্ণকে উচ্ছিষ্ট দানেও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই যে উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। ভক্ত ভগবানের, ভগবান ভক্তের, এ সকল দৃষ্টান্ত আমাদেরই পূর্ব্ব-কাহিনী, আর্য্য-নিষেবিত ভারতে তখন এ ঘটনা সংঘটন প্রতিনিয়তই হইত, প্রতিনিয়তই সাধক সাধনাবলে, ভক্তির প্রবলউচ্ছ্বাসে এইরূপ কত-শত অসাধ্য সাধন করিয়া দেশকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন—তাহার ইয়ত্তা কে করে ?

ভারত ভিন্ন সাধন-ভজনে এরূপ অসাধ্য সাধন করিতে, ভক্তি প্রাবল্যে সেই পরমারাধ্য ধনকে আপনার করায়ত্ত করিতে পৃথিবীর আর কোন দেশে যে কেহ পারিয়াছে বলিয়া শুনা যায় না। অন্য দেশে সাধনার

এমন সনাতন পদ্ধতিই যখন প্রচলিত নাই; সাধনা করিয়া মনুষ্য জন্মের সার সেই সারাৎসারকে যে লাভ করিতে হয়, ইহা যখ তাহাদের বোধগম্য নহে, কেবল মাত্র হাসি খেলায়-দিন কাটাইয়া জাগতিক সুখসৌভাগ্যে পরিতৃপ্ত হইয়া জীবনের দিন কটা কাটাইয় দিতে পারিলেই যাহারা সর্ব্বস্ব মনে করে, তাহারা পরকালের জন্য এম করিয়া কষ্টসাধ্য সাধনা করিবে কেন? আর্য্যজাতি পরকাল মানে তাহাদের ইহকাল সর্ব্বস্ব নহে। ইহার পর যে আবার আসিতে হইবে আবার কর্ম্মসূত্রের আকর্ষণে এখানে ভাগ্যগঠন করিয়া সুখদুঃখের ভাগী হইতে হইবে, আর্য্যজাতির তাহা ভালরূপ বিশ্বাস আছে বলিয়াই গতায়াত নিবারণের জন্য, ভগবানের মোক্ষমূলাধার পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভের জন্য তাহারা এত সাধ্যসাধনা করে এবং সেই সাধ্য-সাধন করিবার পন্থাও এদেশে এত বিভিন্নরূপে প্রচলিত। এই পন্থ সকল ভিন্ন ভিন্নরূপ হইলেও উদ্দেশ্য যে সকলেরই এক; সেই সচ্চিদানন্দ সাগরে আত্মসমর্পণ করিয়া গতায়াত বন্ধ করা ভিন্ন, মুক্তিলাভে এক হইয়া যাওয়া ভিন্ন যে আর কিছুই নহে। তাহা কে না স্বীকার করিবে?

এ দেশের এমনি গুণ, এ দেশের প্রত্যেক অনুপরমানুতে ধর্ম্মের বীজ এমনি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত যে শুধু হিন্দু কেন, এদেশের অন্যান্য জাতিও ধর্ম্মসাধনা না করিয়া থাকিতে পারে না। মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী কত ফকীর, কত সিদ্ধ সাধকও যে এ দেশের মাটী পবিত্র করিয়াছেন— তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য, তবে শ্রীধাম নবদ্বীপে যখন শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব ভক্তির প্রবল বন্যায় দেশ মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন; যে সময় তিনি ভক্তির ভাবে বিভোর হইয়া সকল জাতিকেই সমভাবে কোল দিয়াছিলেন; সেই সময় আমরা যবন হরিদাস নামক একজন ভক্ত-

বীরের বিষয় তদীয় জীবন-চরিতে পাঠ করিতে পাই; আর একজন তাঁহারই সমসাময়িক শাক্তভক্ত যবন সাধক দরাফ খাঁর বিষয়েও নানাবিধ কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। দরাফ খাঁর, জীবনবৃত্তান্ত একরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন, কেহ বলেন—তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণ পুত্র ছিলেন, পরে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন, কেহ বলেন, না তিনি মুসলমানই ছিলেন। ইহার সত্য নির্দ্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই, তাঁহার সম্বন্ধে কোনও ইতিহাসও কোথাও পাওয়া যায় না যে, তাহার দ্বারা তাঁহার বিষয়ে কোন সুমীমাংসা করা যাইবে। তবে তিনি মুসলমান হইলেও যে হিন্দুদেবতার পরম ভক্ত ছিলেন; অকপট হৃদয়ে যে তিনি পতিত-পাবনী গঙ্গাদেবীকে ভক্তি করিতেন; হৃদয়াসনে বসাইয়া ভক্তি-বিমল-পুষ্পে তাঁহার সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রচলিত গঙ্গাস্তোত্র পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায়, মা প্রসন্নময়ী যে এই অকপট ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে সশরীরে দর্শনদানে চরিতার্থ করিয়াছিলেন; সে সম্বন্ধে আমরা যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই উপন্যাসাকারে গ্রথিত করিয়া সাধারণের গোচর করিবার প্রয়াসে এই সূচনার সূত্রপাত।

প্রেমভক্তি বলে সাধনার উচ্চসীমায় আরোহণ করিলে সাধক যে জাতিই হউন না, তখন আর তাঁহার জাতিবিচার থাকে না, সাধনায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিলে যে তিনি সকলের আদর্শ, সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। তাই আজ আমরা মুসলমান শক্তিসাধক দরাফ খাঁর জীবন-চরিত, তাঁহার সাধন ভজনের ক্রমবিকাশ ও পতিত পাবনী গঙ্গার মাহাত্ম্য বিবৃত করিতে অগ্রসর হইতেছি। শক্তি সাধকের, আমি শুধু সাধনার নিয়ম পদ্ধতি জানানুসারে বিবৃত করিয়া ভক্ত-চরিত্র সংগ্রথিত করিবার ইচ্ছায়

অগ্রসর হইতেছি, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা হইলে পাঠকের চিত্তবিনোদন করিতে যে সামর্থ হইব, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই; কারণ তাঁহার ইচ্ছায় জগতে না হইতে পারে না—এমন কার্য্য কি আছে?
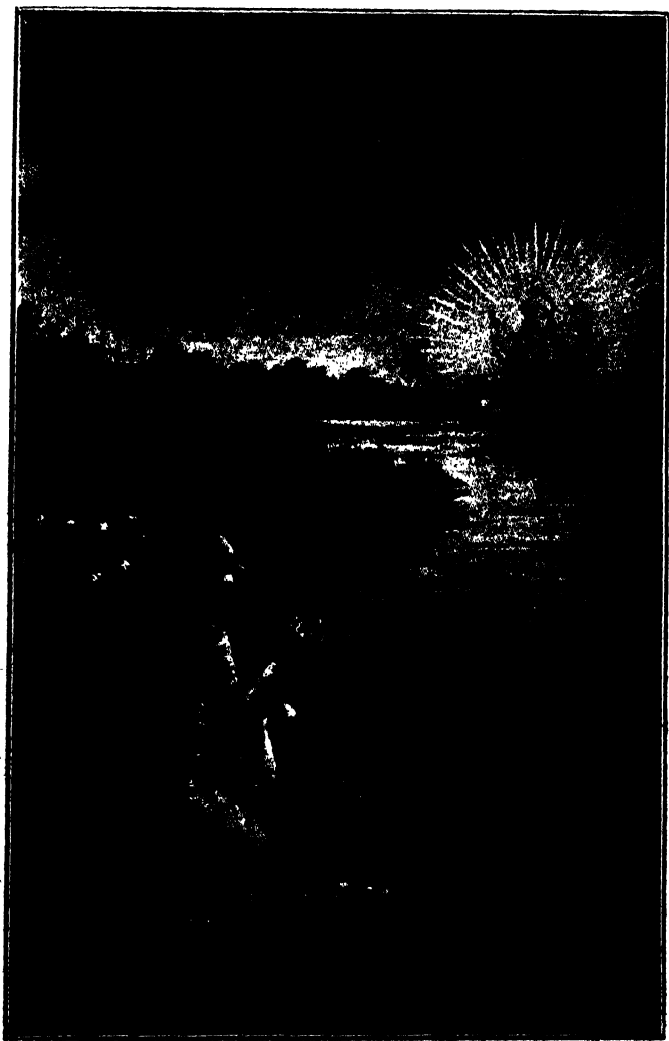
দরাফের গঙ্গা দর্শন।

Lakshmibilas Press.

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জমীদার ভবন।

অনুমান তিনশত বৎসর পূর্ব্বে জাহাঙ্গীর বাদসাহের রাজত্ব সময়ে হুগলীজেলা যখন ইতিহাস প্রসিদ্ধ, ব্যবসা-বাণিজ্যে অতীব সমুন্নত, নানা দিক্‌দেশ হইতে যখন ধনী বণিকগণ আসিয়া ইহার অঙ্গ-শোভা বর্দ্ধন করিত, তখন ইহার সন্নিহিত গ্রাম সকলের সুখ সৌভাগ্যও বড় কম ছিল না। বিশেষতঃ ত্রিবেণী গ্রামের অবস্থা খুব উন্নত এবং সমৃদ্ধ ছিল। একদিকে হিন্দুর তীর্থ গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী সঙ্গম বলিয়া আর একদিক বাণিজ্য-বন্দর বলিয়া ইহা বিশেষ বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল।

ত্রিবেণী হইতে দুই তিন ক্রোশ দূরে দ্বারবাসিনী নামক গ্রামে মুসলমান জমীদার মেহের আলী বাস করিতেন, সুবিস্তীর্ণ জমীদারীর মালিক হইলেও কিন্তু মেহেরের পুত্রাদি কিছু ছিল না, তাই সমস্ত অর্থাদি তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে সদাব্রতে ব্যয় করিতেন। কোন দুস্থলোক বিপদে পড়িয়া মেহের আলীকে জানাইলে তিনি কাহাকেও রিক্তহস্তে ফিরাইতেন না; এমন কি অনেক সময় তিনি অবস্থায়

অতিরিক্তও দান করিয়া ফেলিতেন, কোন প্রকার সঙ্কোচবোধ করিতেন না কিন্তু এরূপ দান করিয়া মেহেরকে কখন বিপদাপন্ন হইতে হয় নাই। ধার্ম্মিকের রক্ষাকর্ত্তা খোদাতাল্লা কোন দিক দিয়া যে পুনরায় তাঁহার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া রাখিতেন, তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারা যাইত না। তাঁহার দান কখন স্বজাতির মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত না, কেবল স্বজাতিকেই দান করিয়া আপনার প্রভুত্ব অব্যাহত রাখিব আর কাহাকেও কিছু দিব না, এরূপ স্বভাব তাঁহার ছিল না। যে প্রার্থী হইয়া আসিত, দুঃখ জানাইত, তিনি তাহার অভাব-অভিযোগের অনুসন্ধান লইয়া প্রকৃত হইলে অকাতরে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন। স্বজাতি অপেক্ষা হিন্দুর মধ্যে তিনি বেশী অর্থ সাহায্য করিতেন। কারণ তাঁহার গ্রাম এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকল হিন্দু প্রজাবর্গে পরিপূর্ণ, মুসলমান খুব কমই ছিল ; যাহারা ছিল, তাহারা তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত আর কেহই নহে। কোন প্রজার কন্যাদায় উদ্ধার হয় না, জমীদার মহাশয়কে জানাইল—বদান্যবর জমীদার তাহার সে অভাব পূরণ করিলেন। কাহার উপনয়ন কার্য্য সমাধা হইতেছে না, মেহের তাহাকে বৃত্তিস্বরূপ মাসিক কিছু কিছু প্রদান করিয়া তাহাকে সে দায় হইতে উদ্ধার করিয়া দিতেন। এইরূপ কত পিতৃমাতৃ দায়ে, কত অপরাপর দায়ে যে তিনি প্রজাবর্গকে মুক্ত করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। মেহের শুদ্ধ মুসলমান ছিলেন, তাঁহার ক্রিয়া কলাপ কিয়ৎ পরিমাণে হিন্দু তান্ত্রিকগণের মত আচরিত হইত। নিজ দেবতার প্রতি তাঁহার একান্ত নিষ্ঠাত ছিলই, হিন্দু দেবদেবীগণের প্রতিও তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ দেখা যাইত। গ্রামান্তরে একটী হিন্দুদেবালয় ও তৎসহ একটী অনাথ

আশ্রম তাঁহারই আনুকূল্যে পরিচালিত হইত। শুনা যায়, ঐ দেবালয়ে কালীমূর্ত্তি স্থাপিতা ছিলেন, একজন অতি বৃদ্ধা হিন্দু রমণীর নামে উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ রমণী নাকি মেহেরের পিতার বন্ধু-পত্নী, তিনি তথায় অবস্থান করিয়া দেবসম্পত্তি ভোগ করিতেন। পূজক ব্রাহ্মণ, বেশকারী ব্রাহ্মণ, পাচক ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অনেক লোক দেবসেবায় নিযুক্ত ছিল; বৃদ্ধাই ঐ সকল দেখাশুনা করিতেন, মুসলমানের সাহায্যে পরিচালিত বলিয়া পাছে কোন অনাথ-অতিথি উহার আশ্রয় গ্রহণ না করে, এইজন্য মেহের খুব গুপ্তভাবে থাকিয়া বৃদ্ধার দ্বারা এই সদাব্রত চালাইতেন। সাধারণ লোকে জানিত—ইহা এই বিধবা ব্রাহ্মণ রমণীর দেবালয় ও সদাব্রত-আশ্রম। কোন হিন্দু অভুক্ত অবস্থায় আসিলে মেহের তাহাকে ঐ দেবালয়ে পাঠাইয়া দিতেন, সেখানে মধ্যাহ্ন সময়ে উপস্থিত হইলে অভুক্ত অবস্থায় কেহই ফিরিত না,—সাধু জমীদার মহাশয় বন্ধুপত্নীর দ্বারা তথায় এরূপ সুবন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বৃদ্ধা এই বৃদ্ধবয়সে একটী প্রতিবাসী অনাথা কুমারীকে লইয়া ঐ মন্দিরে বাস করিতেন—নাম ষোড়শী, বয়স তিনবৎসর আর বৃদ্ধার নাম ভুবনেশ্বরী। ভুবনেশ্বরী ব্রহ্মচারিণী, গৈরিক বসনে সজ্জিত হইয়া বালিকার সঙ্গে মন্দির চত্বরে ঘুরিয়া ফিরিয়া যখন অতিথি অভ্যাগতের আহার যোগাইতেন, তখন বোধ হইত যেন মা অন্নপূর্ণা স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়া অন্নদানে ক্ষুধিতের ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করিতেছেন। তাঁহার সেই মধুমাখা "বাবা অতিথি নারায়ণ এসেছ, বস" কথা শুনিলে বাস্তবিক আর্ত্তের প্রাণ সুশীতল হইত; শিশু বালিকা ষোড়শীও কাছে কাছে থাকিয়া ক্ষমতানুসারে আকাঙ্খিত দ্রব্যাদি প্রদানে তাহাদের সন্তোষ সাধন করিত। বালিকার বয়স এখনও তিন বৎসর উত্তীর্ণ

হয় নাই ; কিন্তু এখন হইতে তাহার প্রাণে যেরূপ ধর্ম্মভাব বদ্ধমূল হইয়াছে, এখন হইতেই সে যেরূপ অতিথি সৎকারে যত্ন করিতে শিখিয়াছে ; কালে না জানি ভগবান তাঁহার দ্বারা এই ভবরূপ অতিথি ভবনে কত আতিথ্য সৎকারের সুযোগ করিয়া লইবেন তাহা কে বলিতে পারে ?

মেহের আলীর পত্নী আমিনা বিবি—বালিকাটীকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, পুত্রকন্যা কিছু না থাকায় তাঁহার যাবতীয় বাৎসল্য স্নেহ সেই কন্যাটীর উপরই ন্যস্ত হইয়াছিল। তাই বালিকা সমস্ত দিন ভুবনেশ্বরীর নিকট মন্দিরে অবস্থান করিয়া বৈকালে আমিনার নিকট আসিত, মেহের তাহাকে গেরুয়া বস্ত্র ছাড়াইয়া বিবিধ বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া দিতেন; ষোড়শী জমীদার ভবন আলো করিয়া এঘর সেঘর করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। বালিকার খেলা দেখিয়া পতি পত্নীর আনন্দ আর ধরিত না। পাঠক! মেহের ও মেহেরপত্নী আমিনার মত নিঃস্বার্থ পরোপকার পরায়ণ জমীদার আর কখন কোথাও দেখিয়াছ কি ? জমীদার হইলে অর্থের লালসা তাহাদের বড়ই প্রবল হইয়া থাকে—ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য ; প্রজাপীড়ন করিয়া, তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া অর্থ দোহন করিয়া লওয়া প্রায় সকল জমীদারেরই মনোগত ইচ্ছা কিন্তু এই আদর্শ মুসলমান জমীদার দম্পতীর মধ্যে যাহা দেখিলে—তাহা আর একালে খুঁজিয়া পাইবে না। সেকালে এরূপ অজস্র ছিল, একালে আর নাই, অতএব ইহা আদর্শ ভিন্ন আর কি বলিব।

পতির অনুরূপ—পত্নী ইহা সকল জাতির মধ্যে বিদ্যমান আছে। মেহের-পত্নীর দান আবার অন্যবিধ ছিল। প্রতিবেশী কোন ভদ্র

গৃহস্থ অভাবের প্রকোপে পড়িয়া দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে অথচ মানের খাতিরে কাহার নিকট কিছু প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, আমিনা গুপ্তভাবে সন্ধান লইয়া তাহাদের বাটীতে যাইয়া ধান্যাদি প্রদান করিয়া আসিতেন। নগদ অর্থাদি আবশ্যক হইলে তাহাও প্রদান করিতেন। কোন প্রজা পীড়াগ্রস্ত হইয়া অর্থাভাবে চিকিৎসা করিতে পারিতেছে না—জীবনে হতাশ হইয়া পড়িয়াছে, আমিনা গুপ্তভাবে তাহার সে অভাবত পূরণ করিতেনই পরন্তু সেবা-ব্রতে ব্রতী হইতেও কুণ্ঠিত হইতেন না, তাঁহার দ্বারা যতটুকু সেবা হওয়া সম্ভব আমিনা তাহা প্রাণপণে সমাধা করিতেন। এই আদর্শ জমীদারের পুণ্যে দ্বারবাসিনী গ্রাম এক সময়ে রামরাজত্বে পরিণত হইয়া স্বর্গের সুখস্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সকলেই দেবতুল্য জমীদারের অধীনে অতুল সুখে কালযাপন করিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্লাবন পীড়নে।

মেহের আলী অশীতিপর বৃদ্ধ, তথাপি তিনি প্রত্যহ এত শারীরিক পরিশ্রম করিতে পারিতেন যে, এখনকার যুবকগণ তাহার শতাংশের একাংশও করিতে পারে না। কেবল ধর্ম্মবল যে মেহেরকে জীবনের প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যাবেলা অবধি এত সবল করিয়া

রাখিয়াছিল, প্রাণে এত সৎসাহস প্রদান করিয়াছিল—তাহা কে অস্বীকার করিবে? আজকাল আমরা যে অল্প বয়সে এত দুর্ব্বল, নানাবিধ রোগগ্রস্ত এবং উৎসাহ বিহীন হইতেছি, ধর্ম্মহীনতাই তাহার একমাত্র কারণ নয় কি? তুমি যে জাতিই হও আর যে বংশেই জন্মগ্রহণ কর, ধর্ম্মহীন হইলে তুমি জগতে কিছুতেই শ্রেয় লাভ করিতে পারিবে না। ধর্ম্ম ভাবই যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রকৃষ্ট উপায়!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—জমীদার মেহের আলী জাতিতে মুসলমান হইলেও যথা সম্ভব হিন্দুর আচার বিচারেই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন! অগম্যা-গমন, অখাদ্য-ভোজন প্রভৃতি অনাচার তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার আত্মীয় স্বজন প্রত্যহ তাঁহাকে মৎস্-মাংস ব্যবহার করিবার উপদেশ দিলে তিনি বলিতেন—"দেখ, কতগুলা যা তা আহার করিয়া উদর পূর্ণ করিলেই শরীর রক্ষা হয় না, আমি যে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছি—ইহা বয়সের স্বধর্ম্ম, পরমায়ু ত ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে, যাইবার সময় ত নিকটবর্ত্তী হইতেছে, আহার করিয়া কেবল দেহ মোটা করিলেই কি কালের হাত এড়াইতে পারা যাইবে, অমিত-প্রভাব কালের নিকট সরু-মোটা, দুর্ব্বল-সবল নাই, যে দিন যাহার সময় হইবে—সে দিন আর তাহার থাকিবার ক্ষমতা নাই। তুমি যতই পরাক্রমশালী হওনা কেন, কালের নিকট তোমার কোন ক্ষমতাই খাটিবে না।" মেহেরের জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিয়া আত্মীয়-স্বজন আর কিছু বলিতেন না।

আমিনা স্বামীকে দেবতার মত দেখিতেন। হিন্দু স্ত্রীগণ স্বামীকে পূজা করে—এ প্রথার তিনি বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন, স্বামী যে স্ত্রীলোকের দেবতা অপেক্ষাও বড়, এ জ্ঞান আমিনার হৃদয়ে বদ্ধমূল

হইয়াছিল বলিয়াই তিনি হিন্দুর মত প্রত্যহ স্বামীর পাদোদক পান করিতেন। স্বামীকে পরিতোষরূপে আহার করাইয়া, অধীনস্থ জনগণকে খাইতে দিয়া দিবাবসানে তিনি অতি গোপনে নিজে আহার করিতেন। স্বামীর শরীর বার্দ্ধক্য বশতঃ ক্রমশঃ কৃশ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া তিনি স্বহস্তে তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার কিছুরই অভাব ছিল না,—গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ, ক্ষেত্র ভরা শস্য, বাগান ভরা ফল, সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণেই ছিল। আমিনা সময়ে সময়ে স্বামীকে পলান্ন সহ মাংসাদি রন্ধন করিয়া দিতেন কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার সে গুরুপাক খাদ্য হজম হইত না; এই জন্য বলিতেন—আমিনা! আর আমাকে ঐ সকল খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দিও না, উহাতে আমার আর তাদৃশ রুচি নাই এবং পরিপাকও হয় না, এইজন্য একাহারী হইব। বৈকালে যে দুগ্ধ হইবে, ষোড়শীর জন্য রাখিয়া বাকী টুকু আমাকেই দিও, অন্য আহারে আর আমার প্রবৃত্তি নাই। বলা বাহুল্য—বৈকালের আহার বালিকা ষোড়শী পিতৃ-মাতৃ স্থানীয় এই আদর্শ জমীদার দম্পতীর নিকটই করিত, অতি শিশু বলিয়া তাঁহারা তাহাকে কোন দুষ্পাচ্য অখাদ্য খাইতে দিতেন না। ধর্ম্ম যে কি জিনিস—এবং আচার-বিচার-বিহীন হইয়া তাহা নষ্ট করিলে যে কি অধঃপতন হয়, তাহা তাঁহারা বেশ জানিতেন; এই জন্য বালিকা কিছু খাইতে চাহিলেও তাঁহারা তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিতেন—মা! ও সকল ছেলে মানুষকে খেতে নেই; অথবা তাহাদের গৃহে বৈকাল বেলায় এমন কোন দ্রব্য প্রস্তুত হইত না, যাহা দেখিয়া বুদ্ধিহীনা বালিকা লোভ সম্বরণ করিতে পারিবে না। অজস্র দুগ্ধ হইত, আর মুড়ি, গুড়, চিঁড়া প্রভৃতির দ্বারা সকলেই সন্ধ্যা বেলার আহার সম্পন্ন

করিত। বেলা তিনটার সময় আহারাদি করিয়া আর সন্ধ্যা বেলার আহার করিতে কাহারও তত ইচ্ছা হইত না। তবে ক্ষেত্রে যাহারা কাজ করিত—তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত ছিল।

দ্বারবাসিনীর জমীদার দম্পতী ধর্ম্মের সংসার পাতিয়া এইরূপ হাসি খেলায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। তখন বর্ষাকালে পল্লীস্থ সকলেই সকল প্রকার আবশ্যকীয় দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিত; কারণ তখন স্থানান্তরে যাইয়া দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনা এখনকার মত সহজ সাধ্য ছিল না—অর্থ থাকিলেও দ্রব্যাদি পাওয়া যাইত না বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া রাখিত। জমীদার ভবনেও অজস্র সঞ্চয় করা হইয়াছে কিন্তু এবার বর্ষার প্রকোপ এত বেশী যে অনেকদ্রব্য ফুরাইয়া যাইতেছে। চারিদিকে বন্যা হইয়া ভাসিয়া গিয়াছে, কত লোক গৃহ শূন্য হইয়াছে, আহারাভাবে কত লোক মারা যাইতেছে; এরূপ হইলে প্রায়ই মেহের আলী স্বয়ং স্থানে স্থানে যাইয়া লোকের সহায়তা করিতেন কিন্তু এবৎসর তাঁহার শরীর এত অসুস্থ যে কোথাও যাইবার ক্ষমতা নাই, তথাপি নিকটবর্ত্তী প্লাবন-পীড়িত ব্যক্তি-বর্গের সাহায্যার্থে তিনি লোক প্রেরণ করিয়াছেন; প্রজাবর্গের মধ্যে কোন প্রকার কষ্ট হইতেছে, শুনিবামাত্রই তিনি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন। একদিন শুনা গেল—দামোদর নদ প্লাবিত হইয়া কত লোক গৃহ শূন্য হইয়াছে, কতলোক মারা গিয়াছে। মেহেরের জনৈক ভৃত্য একটী পাঁচ ছয় বৎসরের শিশুকে জলমগ্ন অবস্থায় নদী হইতে বাঁচাইয়া গৃহে আনিল। মেহের বালকের অবস্থা দেখিয়া ভুবনেশ্বরীর কালী বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া তাহার সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। প্লাবনের আশঙ্কা এখনও কমে নাই, কালী বাড়ী অনেক উচ্চ স্তরের উপর

অবস্থিত; কি জানি যদি বাটীই ভাসিয়া যায়, এই জন্য বালককে তথায় পাঠাইয়া দিলেন এবং এ কয়দিন ষোড়শীকেও আর গৃহে আনিলেন না।

প্রায় একমাসের পর বর্ষার প্রকোপ কমিল; জলস্রোত ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল বটে কিন্তু গ্রামে ব্যাধির প্রকোপ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল, একমাস কাল জলে ভিজিয়া গ্রামে নানা প্রকার পীড়া হইতে লাগিল, গ্রামবাসিগণ পীড়িত হইয়া পড়িল, প্রায় সকলেই গৃহ শূন্য; তাহার উপর একজন না একজন প্রতি সংসারেই শয্যাগত, কে কার সেবা করে। মেহের আলী এই দুর্দ্দিনে কিছুই করিতে পারিলেন না, তাহার শরীর ও ভাল নহে; এক প্রকার শয্যাগত বলিলেই হয়। তিনি নিজের জন্য তত ভাবেন না, কিন্তু দুস্থ প্রজাগণের প্রতি খোদা তাল্লার কোপ দৃষ্টি দেখিয়া বড়ই ভাবিত হইয়া পড়িলেন। প্রজাবর্গের স্বাস্থ্যের জন্য তিনি ক্ষমতানুসারে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন কিন্তু পরের দ্বারা আশানুরূপ কার্য্য হইতেছে না। কেহ সাহাষ্য পাইতেছে, কেহ পাইতেছে না। পরের দ্বারা চিরকাল যাহা হইয়া থাকে—এক্ষেত্রে তাহাই হইতেছে, হায়! দান-বীর মেহের আজ অপারগ বলিয়া প্রজাবর্গ এই কষ্টের সময় সাহাষ্য পাইতেছে না। কর্ম্মচারিবর্গের কার্য্য দেখিয়া মেহের ভাবিয়া ভাবিয়া উত্থান শক্তি রহিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পীড়া ক্রমশঃ ভীষণ ভাব ধারণ করিল। ভুবনেশ্বরী পুত্রতুল্য মেহেরের সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ শুনিয়া জমীদার ভবনে আসিলেন, সাধ্যানুসারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন, বৈদ্য আনিয়া চিকিৎসারও কোন ত্রুটি হইল না। অনাথ বালকটী ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে থাকিয়া আশ্রয়-দাতা মেহের আলীর সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। মেহের আলী

পূর্ব্বে বালকের পরিচয় পাইয়াছিলেন। বালকের একমাত্র বৃদ্ধা জননী বন্যায় ভাসিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তিনি বোধ হয় বাঁচিয়া নাই; বালক ভগবানের কৃপায় তাঁহার ভৃত্যের দ্বারা রক্ষা পাইয়াছে। মেহের বালকের দিব্য কান্তি ও প্রখরবুদ্ধি দেখিয়া তাহাকে অতিশয় যত্ন করিতেন। এক্ষণে বলিলেন—বাবা! তুমি আমার মায়ের কাছে খুব সুখে থাক্‌বে, যখন যা দরকার হবে বল্‌বে, কোন বিষয় সঙ্কোচ বোধ করবে না—এই বলিয়া ভুবনেশ্বরীর প্রতি তাকাইলেন। ভুবনেশ্বরী বলিলেন—বৎস! বালকের জন্য তুমি চিন্তা করিও না, ভগবান যখন উহাকে তোমার আশ্রয়ে আনিয়া ফেলিয়াছেন, তখন বোধ হয়—উহার জীবনস্রোত অনুকূল ভাবেই প্রবাহিত হইবে। মেহের আর কোন কথা কহিলেন না। নয়ন মুদ্রিত করিয়া আল্লার নাম জপ করিতে লাগিলেন।

মেহের জীবনে কখন পীড়িত হইয়া এরূপ শয্যাগত হন নাই। এবার যখন তাঁহাকে শয্যার আশ্রয় লইতে হইয়াছে, তখন এ পীড়া যে সহজ নহে, ইহাই যে তাঁহার জীবনান্ত করিবে—তিনি তাহা পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। বিষয়াদি সমস্ত স্ত্রীর নামে দানপত্র করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে ভুবনেশ্বরীর অধীন হইয়া থাকিতে বলিলেন। পতিগতপ্রাণা আমিনা সংসার অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। হায়! এজগতে তাঁহার যে মমতার জিনিস আর একটীও নাই। যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তিনি সংসার সমুদ্রে কূল পাইয়াছিলেন; যাঁহার স্নেহ-মমতা-ভালবাসা আমিনাকে স্বর্গের সুখ প্রদান করিত, আজ তিনি যখন তাহাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন, তখন বিষয় সম্পত্তির সুখ কি তাহার ভাল লাগে? স্বামি-সুখের নিকট যে

উহা অতি তুচ্ছ। যাহার সহিত বৃক্ষতলে বাস করিলেও স্বর্গের সুখ উপলব্ধি করিতে পারা যায়, তাহার অদর্শনে আমিনা কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিবেন? আমিনা কখন স্বামী ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না; এই জন্য পিতা বড়লোক হইলেও তিনি কখন একাধিক্রমে একমাস কাল তাঁহার বাটীতে অবস্থান করেন নাই; পাছে স্বামীর সেবার ত্রুটী হয়, পাছে তিনি কষ্ট পান। সতী ভিন্ন স্বামীর সেবায় জীবনপাত করিতে, স্বামীকে দেবতার ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া পরিতোষ করিতে, আর কোন রমণীকে দেখিতে পাওয়া যায় না। পাতিব্রত্য হিন্দু-নারী-সমাজেই প্রবল তাহারাই এ ব্রত ভালরূপ বুঝিত, প্রাণপণে ইহা প্রতিপালন করিয়া যমজয়ী হইত কিন্তু তখন হিন্দু-সমাজেই যখন আমিনার মত সতী-স্ত্রী দুষ্প্রাপ্য ছিল, তখন মুসলমান সমাজ ত কোন ছার, সে সমাজে তাহার মত সতী পতিব্রতা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমিনা জীবনে কখন মৃত্যু কামনা করিতেন না, স্বামী জীবিত থাকিতে তাঁহার মৃত্যু হইলে, কে স্বামীর সেবা করিবে, সুখে-দুঃখে কে তাঁহার সঙ্গিনী হইয়া প্রবোধ দিবে—এই জন্য তিনি স্বামীর জীবদ্দশায় মৃত্যু কামনা করা বা তাঁহার মৃত্যু হওয়া উচিত বিবেচনা করিতেন না, ইহাকে তিনি সতীত্বের লক্ষণও মনে করিতেন না। তিনি মনে করিতেন—একত্র সহমরণ, না হয় স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ইহলোক ত্যাগ করাই সতীত্বের লক্ষণ, নতুবা নারী-জীবনের একমাত্র উপাস্য দেবতা, প্রাণ হইতে প্রিয়তম ধনকে কাহার করে সমর্পণ করিয়া যাইব, কে ঠিক আমার মত করিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবে, আমি যেমন মনোমত করিয়া, প্রাণ দিয়া তাঁহার কাজ করিতে পারিব, এ জগতে ঠিক তেমনটি কি আর কেহ করিতে পারিবে? অন্য সকলের ভালবাসা যে স্বার্থ-প্রণোদিত, স্বার্থের সামান্যমাত্র ত্রুটী

হইলে যে তাহারা তাঁহাকে অবহেলা করিবে—তাঁহার দুঃখের মাত্রা বাড়াইবে, তাই আমিনা স্বামীকে রাখিয়া মরণে সুখ আছে বলিয়া মনে করিতেন না। ধন্য সতী! ধন্য তোমার পাতিব্রত্য ধর্ম্ম শিক্ষা! ধন্য তোমার স্বামী অনুরাগ! এরূপ শিক্ষা নারী-জীবনে আর কাহার নাই। তোমার এ শিক্ষার গুরু যিনি, সেই দেবী ভুবনেশ্বরীও ধন্য। ভুবনেশ্বরী বলিতেন—স্বামী ছাড়িয়া সধবা অবস্থায় মৃত্যু ভাল নহে, তাহা হইলে স্বামীর যে কি কষ্ট, স্বামী যে কি অভাব অনুভব করিবেন, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, হয় সহমরণ, না হয় স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বা পূর্ব্বে মরণ অথবা আজীবন স্বামীর পবিত্র মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করা সহস্রগুণে শ্রেয়, তথাপি স্বামীকে রাখিয়া, তাহার প্রাণে শোকশেল হানিয়া, লোকের নিকট—“সধবা সতী” বলিয়া সুখ্যাতি লাভের জন্য ইহলোক ত্যাগ করা সতীর ধর্ম্ম নহে। সতীর সহিত স্বামীর সম্বন্ধ শুধু ইহ-জীবনের নহে, পর-জীবনেরও বটে, তবে নিজের সুনামের জন্য, নিজের স্বার্থের জন্য এত শীঘ্র মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা কেন, সতীত্বে এত স্বার্থের ছায়াপাত করিবার উদ্দেশ্য কি?

ভুবনেশ্বরী আমিনাকে ঠিক হিন্দুস্ত্রীর মত পতি পরায়ণা করিয়াছিলেন। এই জমীদার দম্পতীর আচার-ব্যবহার কতকটা হিন্দুর মত করিয়া লইয়াছিলেন। যত দিন যাইতে লাগিল, মেহের আপনার অবস্থা বেশ বুঝিতে পারিলেন। এ যাত্রা যে আর তাহাকে উঠিতে হইবে না, তাহার জীবন-নাটকের যবনিকা পতন যে অচিরেই হইবে—সাধু মেহের আলী পূর্ব্ব হইতে তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার যৎসামান্য বিষয়-সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিয়া বলিলেন,—সম্পত্তি সমস্তই আমিনার

ভোগ-দখলে রহিল বটে, কিন্তু ভুবনেশ্বরীর কর্তৃত্বাধীনে তিনি তাহা ব্যয়িত করিবেন। পরে তাহা সাধারণ দেবসেবায় নিয়োজিত হইবে। ষোড়শীকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন বলিয়া সামান্য জমী-জমা তাহাকেও দান করিলেন। আর বালকটী দরিয়ায় ভাসিয়া আসিয়া তাহার অধীনে প্রতিপালিত হইতেছে, তাহার রূপ ও গুণ দেখিয়া, এত অল্প বয়সে তাহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য এবং ধর্ম্মভাব দেখিয়া সেই নিরাশ্রয় বালককেও বঞ্চিত করিলেন না। তাহার জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কিছু চাষ-আবাদের জমি প্রদান করিলেন। অনুমান পাঁচ বৎসরের বালক সে ত পরিচয় কিছু দিতে পারে না—কি জাতি, কোথায় নিবাস, কেবল বলে, আমার মা ডুবে মরেছে। এই কথা বলে, আর বালকের অশ্রুজলে বুক ভাসিয়া যায়; ভুবনেশ্বরী তাহাকে সান্ত্বনা করেন, কত প্রকার প্রলোভন দেখান, বালক আদর পাইলে আবার সমস্ত ভুলিয়া যায়—ষোড়শীর সহিত খেলা করিয়া দিন কাটায়। সহৃদয় স্নেহের আধাী জীবনান্ত সময়ে এ নিরাশ্রয় বালকের কিছু কিনারা করিতে ভুলিবেন কেন?

সকলেই অনুমান করে—বালক মুসলমান বংশসম্ভূত, কারণ সে নানী, পানী ইত্যাদি অনেক কথা মুসলমান জাতির মত বলিয়া থাকে কিন্তু ভুবনেশ্বরী বালকের লক্ষণ দেখিয়া অন্যরূপ অনুমান করিতেন এবং মনে করিতেন— বালকের বাটীর নিকটে মুসলমানদের বাস ছিল—তাহাদের বালক-বালিকার সহিত খেলা-ধূলায় কাল কাটাইয়া সে দুই একটী ঐরূপ ভাষা শিক্ষা করিয়াছে। যাহা হউক ইহার স্থির মীমাংসা কিছু হইল না, তবে সে দরিয়ায় ভাসিয়া আসিয়াছিল বলিয়া সকলে তাহাকে "দরিয়ার" বলিয়া ডাকিত।

কাল কাহারও অপেক্ষা করে না, ভাল মন্দের বিচার তাহার কাছে নাই, পরোপকারী ধার্ম্মিক বলিয়া পৃথিবীর উপকারার্থ সে কাহাকেও রাখিয়া যায় না। সময় হইলে আপন কর্ত্তব্য পালন করে—তাহাতে কাহার নিরানন্দ হউক, বা কাহার আনন্দই হউক, তাহার প্রতি দিক্‌পাত করা কালের স্বভাব বিরুদ্ধ। নির্ম্মম কাল ক্রমশঃ মেহের আলীর উপর আপন স্বভাবের প্রভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। দিন দিন জমীদার মহাশয়ের অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল, এত চিকিৎসা, এত সেবা-শুশ্রূষা কিছুতেই কিছু হইল না। মেহেরের অবস্থা মন্দ হইতেছে শুনিয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজন তাঁহার সহিত শেষ-দেখা করিতে আসিল। মেহেরের একজন দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় ছিল, সে মনে করিয়াছিল, মেহেরের যখন কোন সন্তানাদি নাই, তখন বিষয়-আশয় সমস্ত তাহারই নামে লেখাপড়া করিয়া দিবে, কিন্তু আসিয়া যখন সে শুনিল—পূর্ব্ব হইতে সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে, তখন সে মনে মনে সাতিশয় রাগান্বিত হইয়া গেল। মেহের আলী এখন পার্থিব কোন বিষয়ে আর মতিস্থির করেন নাই। আজ কয়েকদিন হইল তিনি মনে-প্রাণে কেবল খোদার পাদপদ্মে দৃঢ়চিত্ত হইয় পরকালের পথ পরিষ্কার করিতেছেন, হে মহম্মদ রসুল, হে পতিতপাবন খোদাতাল্লা! আমায় রক্ষা কর; আমি এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে তোমার পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করিলাম। ভক্তের কাতর ক্রন্দন বুঝি ভগবানের কাণে পৌঁছিল, সাধু ভক্ত মেহের আলী সেইদিন দ্বিপ্রহর রজনী যোগে সকল আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় লইয়া সত্তর বৎসর বয়সে হাসিতে হাসিতে ইহধাম ত্যাগ করিলেন। সতী আমিনা প্রিয়তমের অদর্শনে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। পুত্রসম মেহেরের মৃত্যুতে সংসার-বিরাগিনী

ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতপালিনী ভুবনেশ্বরী দেবী ভুবন অন্ধকার দেখিলেও সতী আমিনার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। সতী যখন চৈতন্য লাভ করিলেন—তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে, আত্মীয়-স্বজন মেহেরের শব-দেহ কবরস্থ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে।

এই সময় হইতে দারুণ শোকাভিভূতা আমিনা ভুবনেশ্বরী দেবীর কথা মত, ঠিক হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ মত জীবনের কয়টা দিন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনে কালযাপন করিতে লাগিলেন এবং প্রত্যহ স্বামীর কবরস্থানে আহারাদি প্রদান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে প্রাণের দেবতা! তুমি আজ স্বর্গগত, লোক-লোচনের অন্তরালে অবস্থিত হইলেও আমার হৃদয় ছাড়িয়া যাইতে পার নাই। আমার হৃদয়পদ্মে সততই তোমার সে মোহন মুরতী বিরাজিত দেখিতেছি, সে জন্য আমার কোন অভাব হয় নাই, অভাব হইবেও না; যতদিন কৃপা করিয়া জীবিত রাখিবে দেব! ততদিন যেন ঠিক এইভাবে মনের মন্দিরে তোমাকে রাখিয়া পূজা করিতে পারি। ভোগ না দিয়া দাসী ত কিছু স্পর্শ করিবে না—তাই স্বহস্তে রাঁধিয়া তোমার মনের মত ভোগ আনিয়াছি, আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হও, এই বলিয়া যাবতীয় উপাদেয় দ্রব্যাদি আমিনা কবরের উপর ঢালিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আনমনে কি বলিতে বলিতে আবার ফিরিয়া আসিতেন। এবং গৃহের অবশিষ্ট আহারীয় দ্রব্য সকল প্রাণধারণের মত কিছু কিছু ভক্ষণ করিতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সদ্ব্যয়ে ধনক্ষয়।

মুসলমান সমাজের নিয়মানুসারে একচল্লিশ দিবসান্তে আমিনা স্বামীর প্রেতকৃত্য মহাসমারোহে সম্পন্ন করিলেন। স্বামী যে সকল দ্রব্য ভাল বাসিতেন, যে দ্রব্য উপভোগ করিয়া তিনি প্রীত হইতেন, আমিনা বহু ফকির, মোল্লা ও আত্মীয় স্বজনকে সেই সকল উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করাইলেন। ভুবনেশ্বরী বলিতেন—সাধু পুরুষ মরিয়া দেবতা হয়, তোমার স্বামী যেরূপ দয়াবান পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন—তাহাতে তিনি দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। অতএব জীবের পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারিলেই তাঁহার তৃপ্তি সাধন করা হইবে। এইজন্য আমিনা ভুবনেশ্বরীর পরামর্শে বহু দীন-দরিদ্র, ফকির, পীরের, মোল্লাগণের পরিতোষ সম্পাদন করিলেন। অপরাপর জাতীয় দরিদ্র-নারায়ণগণ যাহারা মেহের আলীর শ্রাদ্ধ-বাসরে কিছু আশা করিয়া আসিয়াছিল, আমিনা তাহাদিগকেও একখানি করিয়া বস্ত্র, এক কাঠা চাউল ও একটী করিয়া মুদ্রা প্রদান করিলেন। মেহের-পত্নী আমিনার বদান্যতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহারা সকলে তাঁহার স্বামীর স্বর্গ কামনা করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

মেহের আলী খুব পাকা জমীদার, দুর্জ্জনের শাসন ও সুজনের পালন করিতে তিনি সদাই বদ্ধপরিকর ছিলেন। প্রবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতেছে, তাহাকে নির্য্যাতিত করিতেছে, দেখিলে মেহের প্রাণপণ করিয়াও তাহার উদ্ধার সাধন করিতেন—ইহাতে তাঁহার সর্ব্বস্ব নষ্ট হইলেও পশ্চাৎপদ হইতেন না, তিনি ধার্ম্মিকের বন্ধু ও

অধার্ম্মিকের শত্রু ছিলেন। অন্যায় তাঁহার নিকট প্রশ্রয় পাইত না, ন্যায়ে তিনি গলিয়া যাইতেন, ন্যায়বানকে বুকে তুলিয়া আদর করিতেন। এই জন্য তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণের মধ্যে কোন কোন দুর্বৃত্ত লোক তাঁহার বিপক্ষ ছিল, তাঁহার মৃত্যুর পর তাহারা প্রবল শত্রুরূপে আমিনার সর্ব্বনাশ করিয়া বিষয়-আশয় আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বিশেষতঃ তাঁহার খুল্লতাত পুত্র নাজেম আলী তাঁহার শত্রুতা সাধনে কিছুমাত্র পরাঙ্মুখ হইল না। সে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া অগ্নি-শর্ম্মা হইয়া উঠিল। অনেকেই তাহাতে ইন্ধন দিয়া বলিতে লাগিল—নাজেম তাহার হক্ অংশীদার, তাহাকে কিছু না দিয়া মেহের আলী ভাল কাজ করে নাই, সে দানধর্ম্মে খুব ভাললোক ছিল বটে কিন্তু শেষটা নাজেমকে প্রতারিত করা তাহার মত একজন বিজ্ঞ জমীদারের উচিত হইয়াছে কি? নাজেম সকলের উৎসাহ পাইয়া বিষয়ের লোভে ফুলিয়া উঠিল এবং ভিতরে ভিতরে আমিনার সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করিতে লাগিল। কিন্তু ভুবনেশ্বরীর প্রখর বুদ্ধিবলে সে বড় একটা কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না।

ভুবনেশ্বরী স্ত্রীলোক হইলেও তাঁহার সকল বিষয়ে এমন একটা প্রখর বুদ্ধি ছিল, বাক্যে এরূপ একটা সতেজ ভাব ফুটিয়া উঠিত যে শত্রু পক্ষ তাহা শুনিলে তাঁহাকে যমের মত ভয় করিত, সাহস করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিত না। ভুবনেশ্বরী মনে মনে বুঝিয়া ছিলেন—এ বিষয় রক্ষা করা সহজ হইবে না। কাজীর বিচারে বিষয় হস্তান্তর হইবেই হইবে। তবে দরিয়ারকে ও ষোড়শীকে মেহের স্বইচ্ছায় যে দানপত্র করিয়াছে—তাহার ব্যতিক্রম কেহ ঘটাইতে পারিবে না। এই জন্য যত দিন না কোন গোলযোগ উপস্থিত হয়, ততদিন আমিনাকে তিনি অজস্র ব্যয়

করিবার উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন—মেহের আলীর বিরহে সতী আমিনা বেশী দিন বাঁচিবে না, এই সামান্য দিনের মধ্যে তাহার শরীর যেরূপ ক্ষয় হইয়া আসিতেছে,তাহাতে স্বামি-শোকশেল যে তাহাকে বিষম লাগিয়াছে,আর ঐ শেল যে শক্তিশেল রূপে শীঘ্রই তাহার জীবন হরণ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, তবে সৎ উপদেশ এবং ধর্ম্ম-কর্ম্ম করাইয়া যতটা তাহাকে জীবনের পথে অগ্রসর করিয়া রাখিতে পারা যায়—ততটাই মঙ্গল। আমিনা সতী,—আদর্শ সতী, মুসলমান সমাজের উজ্জ্বল কোহিনুর—সে নিজের ধর্ম্মবলে, পাতি-ব্রত্যের দৃঢ়তার ফলে অবহেলায় ভবাব্ধি উত্তীর্ণ হইবে—কাহারও সহায়তা তাহার আবশ্যক হইবে না। তবে মেহের আলীর ধর্ম্মোপার্জ্জিত, দরিদ্র সেবা-কল্পে সঞ্চিত বিষয় সকল যে একজন বর্ব্বর অধার্ম্মিকের হাতে পড়িয়া অপব্যয়িত হইবে—তাহা তিনি দেখিতে পারিবেন না, এই জন্য সময় থাকিতে ভুবনেশ্বরী আমীনাকে দীন-দরিদ্র-সেবায় পতির মত মুক্ত হস্ত হইয়া দান করিবার পরামর্শ দিলেন। আমিনা মাতৃসমা ভুবনেশ্বরীর উপদেশ মত সমস্ত কার্য্য করিতে লাগিলেন এবং সদা সর্ব্বদা মৃত স্বামীর স্মৃতি বুকে করিয়া অতিকষ্টে কাল কাটাইতে লাগিলেন। আমিনা রাত্রে নিদ্রা যাইতেন না, তিনি যেন নিভৃত রজনীতে তাহার স্বামীকে তাহার পার্শ্বে আসিয়া বসিতে দেখিতেন, তাহার সহিত কথা কহিবার প্রয়াস পাইলে তিনি আগ্রহ সহকারে স্বামীর কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং কতদিন আর এরূপ করিয়া বৃথা জীবন ধারণ করিতে হইবে—তাহাও জিজ্ঞাসা করিতেন। তাহার উত্তরে তিনি যেন শুনিতে পাইতেন—দেখ,আমিনা! আরও দুই বৎসর তোমাকে থাকিতে হইবে—অগ্রে দেবী ভুবনেশ্বরীর মৃত্যু হইবে—তারপর তুমি দরিয়ার সহিত ষোড়শীর বিবাহ

দিয়া ইহলোক ত্যাগ করিও। ষোড়শীর সহিত তাহার যেরূপ ভালবাসা, তাহাতে তাহাদের মিলন অতি সুখকর হইবে। বালক দরিয়ার একজন সামান্য বালক নহে, একদিন উহার ধর্ম্মভাবে জগৎ পবিত্র হইবে। মুসলমান সমাজ একদিন উহার যশোগৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিবে। বালক, কালে হিন্দুর গঙ্গাদেবীর মহাভক্ত হইবে—তাহার সাধনায় দেবী প্রসন্না হইবেন। তুমি ভুবনেশ্বরীকে এই সকল কথা বলিয়া তাহাদের মিলন সংঘটন করাইবার চেষ্টা করিবে—কিন্তু দরিয়ার বা ষোড়শীর নিকট এ সকল কথা ক্ষুণাক্ষরেও প্রকাশ করিবে না। নাজেম আলী যে তোমার বিপক্ষে লাগিয়াছে—ভুবনেশ্বরী জীবিতা থাকিতে সে কিছু করিতে পারিবে না, ভুবনেশ্বরী সাক্ষাৎ দেবী, নাজেমের সাধ্য নাই যে সে তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে—তবে তিনি যে আর বেশীদিন বাঁচিবেন না—একথা তাঁহাকে বলিও না। আগামী শীতকালে তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য, তাঁহার মৃত্যুর পর শত্রুপক্ষ প্রবল হইবে—সেই সময় তুমি দরিয়ার সহিত ষোড়শীর বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে গৃহী করিয়া দিবে—এই কাজ শেষ হইলে কর্ম্মক্ষেত্রে তোমার অস্তিত্ব লোপ হইবে—তাহা হইলেই আমরা পুনরায় একত্র মিলিতে পারিব। তোমার মৃত্যুর পর যৎসামান্য সম্পত্তি যাহা থাকিবে—তাহা নাজেম দখল করিবে। দরিয়ার ও ষোড়শীর বিষয়ে সে আইন মতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। তুমি যত দিন জীবিত থাকিবে, আমি এইরূপ সময়ে সময়ে আসিয়া উপদেশ দিব কিন্তু এ দেহে মিলনের আশা অসম্ভব! এই বলিয়া মেহের আলীর ভৌতিক আত্মা অন্তর্হিত হইল। আমিনা কিছুক্ষণ বিস্ময় সহকারে গৃহের মধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। কি এক স্বর্গীয় গন্ধে কক্ষতল তখনও ভোরপুর, আমিনার বিরহ

বিশুষ্ক হৃদয় ক্ষেত্রে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত; সতী আশার কুহকে মোহাচ্ছন্ন হইয়া ভূমিতলে অঞ্চল বিস্তার করিয়া শুইয়া পড়িলেন, হৃদয় পুলকে পূর্ণিত হওয়ায় সে রাত্রি সেইরূপ বিনিদ্র ভাবেই কাটিয়া গেল। দেবতার অমিয়-মধুর বচনসুধা পানে, তাঁহার হৃদয়ের যাবতীয় সন্দেহ নির্ব্বাপিত হইল, আমিনা সে মধুর স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রভাতে সুখে শয্যা ত্যাগ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দেবীর দেহান্তর।

দ্বারবাসিনী গ্রামের দেবালয় সমীপবর্ত্তী পুষ্করিণীর বাঁধাঘাটে একটী বালক ও একটী বালিকা খেলা করিতেছে। অদূরে একটী বর্ষীয়সী বিধবা তাহাদের ক্রীড়া-কৌতুক দেখিয়া মুচকী মুচকী হাসিতেছেন আর বলিতেছেন—হ্যাঁরে দরিয়ার! ঠাকুরুণের অসুখ, তিনি ডাকিয়া খাওয়ান নাই বলিয়া কি আর তোদের খিদে-তৃষ্ণা নাই; এখনও কি খেলা ছাড়িতে পারছিস না; বেলা যে অনেক হয়ে গেছে; বামুন ঠাকুর চলে গেলে কিন্তু আজ আর খাওয়া হবে না।

দরিয়ার বলিল—আমি কি করব মা; ষোড়শী যে যাচ্ছে না; তুমি ওকে একবার ডাক না, ও যে প্রতিমা বিসর্জ্জন না করে যাবে না। বালক বালিকা হিন্দুর মত মাটীর ঠাকুর গড়িয়াছে, তাহাদের পূজা-ভোগ দিয়াছে, এইবার বিজয়া করিয়া তাহারা ঘরে ফিরিবে।

বৃদ্ধা বলিল—ও ষোড়শী! আর কেন মা, বেলা অনেক হয়েছে,

বামুন ঠাকুর এখনি চলে যাবেন ; তোমরা খেয়ে নিয়ে ঠাকরুণের কাছে বসো, আমি বাটী থেকে দুধ নিয়ে আসি।

বালিকা বলিল—কেন মা ! আজ কি ঠাকুর মা ভাত খাবেন না ? বৃদ্ধা বলিল—না না, কবিরাজ ভাত খেতে বারণ করেছেন, আজ তার অসুখ বড় বেড়েছে ।

অসুখ বাড়িয়াছে—শুনিয়া বালক বালিকা খেলায় ক্ষান্ত দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণের হাতে তাহাদের সমর্পণ করিয়া বাটীতে দুধ আনিতে গেলেন। ঠাকুর বালক দুইটীকে পার্শ্বস্থ গৃহে আহারাদি দিয়া আসিলেন।

রাস্তায় যাইতে যাইতে বৃদ্ধা আমিনা, দরিয়ার ও ষোড়শীর মধ্যে যে প্রগাঢ় সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছে, তাহার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে যাইতে লাগিল। বৃদ্ধা বলিল—দুইজনে একদণ্ড কাছ ছাড়া হয় না, দুইটীতে যেন একপ্রাণ—এক আত্মা ; সকলেই বলে দরিয়ার মুসলমানের ছেলে সে দিন আবার দেবতার মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে আমার সন্দেহ একেবারে দূর হয়েছে। আহা ! ভগবান দরিয়ার ও ষোড়শীকে বাঁচিয়ে রাখুন, মুসলমান সমাজ তাহাদের খোস্‌নামে ভরে উঠুক। আচ্ছা, ঠাকুরুণ কি আর এ যাত্রা রক্ষা পাবেন না ? আমিনার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল,—দেবতার মুখে শুনিয়াছেন—এই শীতেই তাঁহার মৃত্যু হইবে—তবে এখন উপায় ! দরিয়ার ও ষোড়শীর কি হইবে ! আহা ! দুইটীর যেমনই রূপ, তেমনি গুণ। একটী আধফুটন্ত গোলাপ, আর একটী চাঁপার কুড়ি, এরা ফুটিয়া একসঙ্গে মিলিলে, গন্ধে যে জগত আমোদিত করিবে—তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমিনা এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে গৃহে গমন করিলেন এবং দুগ্ধ লইয়া পুনরায় দেবালয়

অভিমুখে রওনা হইলেন। ভুবনেশ্বরী আজ অষ্টাহ হইল—সান্নিপাতিক জ্বরে শয্যাগত; কবিরাজ দেখিতেছে কিন্তু তিনি ঔষধ খাইতে রাজী নহেন; তিনি বলেন—এ বৃদ্ধ বয়সে আর ঔষধ কেন? তাঁহার ত আর বাঁচিবার তত ইচ্ছা নাই; আর ইচ্ছা থাকিলেই বা আয়ুহীনের জীবন দান করা কাহার সাধ্য! আমিনা ঠাকুরুণের অবস্থা দেখিয়া বড়ই কাতর হইয়াছেন; তিনি আহার নিদ্রা ভুলিয়া কেবল দেবালয়ে বসিয়া আছেন, কখন বা ঘরে আসিতেছেন, আবার যাইতেছেন। পুরোহিত ঠাকুর মাতৃসমা ভুবনেশ্বরীর সেবা করিতেছেন। দারুণ শীতলকাল। রজনীযোগে লোকে বাটীর বাহির হইতে পারে না। পল্লীগ্রামে সকলেই সন্ধ্যার পর গৃহমধ্যে আবদ্ধ হইয়াছে, হিম লাগিবার ভয়ে কেহ আর বাহিরে নাই। এই সময় কবিরাজ মহাশয় আসিয়া বলিয়া দিলেন—আজিকার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ, এই যে ঘাম আরম্ভ হইয়াছে, বোধ হয় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় ইহাতেই নাড়ী ছাড়িয়া যাইবে। পুরোহিত ভয় পাইলেন, আমিনা এ কয়দিন মন্দির সংলগ্ন একটী গৃহে রাত্রি যাপন করিতেছিলেন। তিনি শুনিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। দরিয়া ও ষোড়শী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—তাহারা ঠাকুরুণের এত শক্ত পীড়ার বিষয় কিছু বুঝিতে পারে নাই। বালবুদ্ধির বশে তাহারা জানে সকলের যেমন অসুখ হয়, ঠাকুরুণের তেমনি হইয়াছে, দুইদিন পরে সারিয়া যাইবে। কিন্তু হায়! অভাগিনী ষোড়শী, তুমি ত জান না, বিধাতা আজ তোমার প্রতি কিরূপ নির্ম্মম, তোমার হৃদয়ে কিরূপ বিষম বেদনা দিয়া তোমার একমাত্র আশ্রয়বৃক্ষটীকে চির তরে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিতেছে। হায়! দেড় বৎসরের পিতৃ-মাতৃহারা শিশু, বৃদ্ধার বুকের রক্তে প্রতিপালিত হইয়া আজ পাঁচ

বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে ; শোকের বিষয় তাহার কোমল হৃদয় ত কিছু বুঝে না—কিছু জানে না, তবে প্রতিপালক মেহেরের স্বর্গ গমনে সে কথঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছে মাত্র, তাঁহার মৃত্যুতে সে যেন কি একটা বিষম অভাব অনুভব করিতেছে ; ঠাকুর মা বলেন—সে জমীদারীতে বেড়াইতে গিয়াছে, আবার আসিবে এরূপ স্তোক বাক্যে বালিকা এক প্রকার সান্ত্বনা মানিয়া তাহার প্রাণের দোসর দরিয়ার সহিত খেলা ধুলায় দিন কাটাইতেছে। সে আজ প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল, এখন সে পূর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞান লাভ করিয়াছে। জীবন-মৃত্যু কি, কতকটা বুঝিতে পারিয়াছে, এ সময় হঠাৎ তাহার অদৃষ্ট এরূপ ভাবে ভাঙ্গিয়া দিলে বালিকা কি আর জীবিত থাকিবে! তাহার যাবতীয় স্নেহ-মমতা, আদর-আবদার সমস্তই বৃদ্ধা ভুবনেশ্বরীকে জড়াইয়া আছে ; এ অবস্থায় কৃতান্ত-কুঠারে বৃক্ষ কর্ত্তিত হইলে হায়! ষোড়শীর গতি কি হইবে? কিন্তু তা বলিয়া ত মৃত্যু কাহারও মুখাপেক্ষা করিবে না, কাহারও কথা শুনিবে না।

আমিনা অঙ্গিনায় বসিয়া কাঁদিতেছিলেন, কবিরাজের মর্ম্মভেদী কথা শুনিয়া বলিলেন—মশাই! এখন উপায় ; আপনি না হয় দয়া করিয়া রাত্রে এই স্থানে অবস্থান করুন ; আমরা আপনার পারিশ্রমিক দিব। হিন্দু বিধবাকে ত তীরস্থ করা আবশ্যক।

আমিনা মুসলমান কন্যা হইলেও হিন্দুরগ্রামে বাস হেতু তিনি হিন্দুর সমস্ত আচার-ব্যবহার অবগত ছিলেন। এত বৃদ্ধ বয়সের হিন্দুকে যে ঘরের ভিতর মারা ভাল নহে, তাহাতে যে লোকে দোষ দিবে—তাহা আমিনা জানিতেন, তাই বলিলেন—বাবা! আপনি আজ রাত্রের মত এখানে থাকুন, সেই সময়ের কিছু পূর্ব্বে আমাদের সতর্ক করিয়া দিবেন,

আমরা তাঁহার সদ্গতির চেষ্টা করিব। কবিরাজ স্বীকৃত হইয়া বাটীতে সংবাদ দিয়া আসিলেন। অর্থ পাইলে লোকে সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে পারে; আর এ কাজ ত কবিরাজেরই অভ্যস্ত— করিবেন না কেন?

ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল। গ্রামখানি দারুণ অন্ধকারে ডুবিয়া পড়িল; বিনা আলোক সাহায্যে আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না, গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইতে হইলেও আলোর দরকার; আমিনা সেই দারুণ শীতের সূচীভেদ্য অন্ধকারে মন্দির চত্বরে বসিয়া রহিলেন, কখন বা পশ্চাদ্দিকের নিজ প্রকোষ্ঠের দ্বারে উৎকর্ণ হইয়া রোগিনীর বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। পুরোহিত মহাশয় এইবার কালীকার রাত্রিকালীন ভোগ প্রদান করিলেন। ভুবনেশ্বরীর আরোগ্য কামনায় কত মানসিক করিলেন, বলিলেন—মা! দেবী ভুবনেশ্বরীই এ মন্দিরের সর্ব্বে সর্ব্বা, তাঁহারই আগ্রহে এই দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমরা তোমার পদাশ্রয়ে আশ্রয় লইয়াছি; মা! বালক দুইটীও নিতান্ত শিশু; এ অবস্থায় ভুবনেশ্বরীকে আরোগ্য করিয়া মা কিছু দিনের জন্য তাহাদের আশ্রয় দাও; তাহা না হইলে শত্রুদল যেরূপ পরিপুষ্ট হইয়াছে-তাহাতে 'অচিরেই সমস্ত লণ্ড-ভণ্ড হইয়া যাইবে। মা! রক্ষা কর। ইহার পর আরত্রিক ক্রিয়া সমাধা করিয়া পুরোহিত বাহিরে আসিলেন। জমীদার পত্নীর জন্য কিছু প্রসাদী ফল রাখিয়া আপনি সমস্ত দিনের পর কিছু জলযোগ করিলেন। পুরোহিত রামানন্দ আজ ক্রমাগত কবিরাজ বাড়ী যাতায়াত করিয়া আহারের সময় পান নাই; অথবা তাহার আশ্রয়দাত্রী ভুবনেশ্বরীর জীবন সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া আহারে রুচিও ছিল না। তবে অহোরাত্র ত উপবাসী থাকা ভাল নহে,

পরিশ্রম ত তাহাকেই করিতে হইবে; উপবাসে শরীর দুর্ব্বল হইলে —দেবীর সেবার পাছে ক্রটী হয়, এই জন্য কিছু জলযোগ করিয়া লইলেন, জমীদার পত্নী আমিনাকেও কিছু খাইতে দিলেন।

রাত্রি যত বেশী হইতে লাগিল, প্রকৃতির ভীষণতা তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শীতের প্রকোপে আর কাহার সাড়া শব্দ পাওয়া যাইতেছে না। মন্দিরের চারিধারেই বৃক্ষশ্রেণী নিঝুমভাবে জড়সড় হইয়া দণ্ডায়মান, অদূরে বিস্তীর্ণ প্রান্তর—বিশাল বপু লইয়া নীরবে নিদ্রিত, সময়ে সময়ে একটা একটা উদ্দাম-হিমকর-সিক্ত বাতাস তাহার নিদ্রাভঙ্গের জন্য কত চেষ্টা করত বিফল মনোরথ হইয়া মন্দির সন্নিহিত বৃক্ষের উপর পতিত হইয়া তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিতেছে। অত্যাচারিত বৃক্ষ সকল কখন দুলিতেছে, কখন অসহ্য বোধে শাখা প্রশাখারূপ হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহার পদে প্রণাম করত অব্যাহতি প্রার্থনা করিতেছে। সময়ে সময়ে অন্ধকারময় প্রান্তর মধ্যে এক একটা আলোক আলেয়ার মত জ্বলিয়া উঠিতেছে, আবার নিভিয়া যাইতেছে। সেই সময় কোনও গৃহস্থ গৃহে অনাগত কোনও যুবককে ক্রুদ্ধ হইয়া ডাকিতেছে,—"পদোরে" যুবক পদ্মলোচন ক্রীড়া কৌতুকে মত্ত হইয়া তখনও বাটী আসে নাই। সে দূর শ্রুত ক্ষীণশব্দ শ্রোতার কর্ণে যে কি সুধাবর্ষণ করিতেছে, তাহা যাঁহারা এই গভীর নিস্তব্ধ পল্লীগ্রামে কোন দিন নিশা যাপন করিয়াছেন, তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিবেন। সুর-লয়-বিমিশ্রিত বীণাধ্বনিও বোধ হয় সে সময় শ্রোতার কর্ণে তেমন সুধা বর্ষণ করিতে পারে না। যেখানে শৃগাল কুক্কুরেরও সাড়া শব্দ নাই, এমন কি একটি পক্ষীর পক্ষধ্বনিও শ্রবণ গোচর হয় না—সেখানে হঠাৎ মানবকণ্ঠে উচ্চারিত শব্দের দূর-শ্রুত-স্বর-লহরী যে কত মধুর এবং

তাহা মানবকে কত প্রোৎসাহিত করিতে পারে, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই বিশেষ অবগত আছে।

এ হেন সময়ে কবিরাজ মহাশয় আর একবার রোগিণীর নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। রোগিনীর অবস্থা যেন একটু ভাল হইতেছে; ভুবনেশ্বরীর ক্রমশঃ চৈতন্য সঞ্চার হইল; তিনি ইতস্ততঃ চাহিয়া রামানন্দকে ডাকিলেন। পুরোহিত রামানন্দ শশব্যস্তে নিকট আসিলে তিনি তাহাকে বসিতে বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—আমিনা কোথায়? কবিরাজ মহাশয় আমিনাকে ডাকিয়া আনিলেন। আমিনা সাশ্রু নয়নে গৃহে মধ্যে আসিয়া শয্যাতলে উপবেশ করিলেন। বালক বালিকাকে একবার দেখিবার ইচ্ছা হইল কিন্তু তাহারা তখন ঘুমাইয়াছে বলিয়া আর দেখিবার প্রয়োজন বিবেচনা করিলেন না। এইবার আমিনাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—মা আমার! আমার দিন শেষ হইয়াছে; আর থাকিতে পারিলাম না; তোমারও শেষ দিন নিকট-বর্ত্তী, কোন চিন্তা করিও না।" তারপর রামানন্দের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—বৎস রামানন্দ! তোমাকে বাল্যকাল হইতে মানুষ করিয়াছি, তুমি আমার দেবতার আশীর্ব্বাদী ফুল; তুমি নিরাশ্রয় বলিয়া তিনি যাইবার সময় আমার হাতে হাতে তোমাকে সমর্পণ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন—মায়ের কৃপায় আজ তুমি মানুষ হইয়াছ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছ; দেবী-সেবা করিয়া আজ বহুদিন অতিবাহিত করিতেছ—মায়ের আশীর্ব্বাদ তোমার প্রতি অক্ষুণ্ণ থাকুক, তুমি সংসারী হইয়াছ, এক্ষণে স্ত্রীপুত্র লইয়া দেবীর সেবায় প্রাণপাত কর—জীবনে কখন অভাব হইবে না। মনে বড় ইচ্ছা ছিল—ষোড়শী ও দরিয়ার বিবাহ দিয়া সংসারী করিয়া যাইব কিন্তু সে সাধ মিটিল না। এখন ইহা তোমার

কার্য্য, কখন অবহেলা করিও না। আমি ত চলিলাম, আমিনাও শীঘ্র যাইবে। তাহার পর বিষম ঝড় তোমার উপর দিয়া বহিতে আরম্ভ হইবে। শত্রুপক্ষ সমস্ত বিষয় কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিবে। তবে দেবোত্তর সম্পত্তি লইতে পারিবে না, ইহা তোমারই নিজস্ব রহিল—পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিও, মেহের প্রদত্ত দরিয়ার ও ষোড়শীর বিষয়ে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। তাহাদের ও তোমার মালেকানী সত্বের পাটাপত্র সিন্দুকের ভিতর আছে; এই চাবি গ্রহণ কর। অপর সম্পত্তির লোভ পরবশ হইয়া মামলা মকর্দ্দমা করিয়া বৃথা অর্থ নষ্ট ও অধর্ম্ম সঞ্চয় করিও না। বিবাহ দিয়া উহাদিগকে মেহেরের বাটীতে রাখিবে। এক্ষণে আমার সময় হইয়াছে—গঙ্গা স্নানের আয়োজন কর। ভুবনেশ্বরী যেন এতদিন সমাধিস্থ ছিলেন, হঠাৎ চৈতন্য হইল, দীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বে যেমন একবার ভাল করিয়া জ্বলিয়া উঠে, দেবী ভুবনেশ্বরীও সেইরূপ জাগিয়া উঠিলেন এরূপ সচৈতন্যভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে আর কেহ পারে না, সাধক না হইলে এ সৌভাগ্য সাধারণ মানবে অসম্ভব। ভুবনেশ্বরীর কথা শুনিয়া আমিনা কাঁদিতে লাগিলেন ভুবনেশ্বরী বলিলেন—মা! কেঁদো না, তুমি পিছনে পিছনে আসিবে, তোমাকে এ শত্রুপুরীতে ফেলিয়া আমার মরণেও সুখ হইবে না।" রামানন্দ দেবীকে তীরস্থ করিবার জন্য লোক সংগ্রহে বাহির হইলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন হিন্দুসমাজ এত অধঃপতিত হয় নাই, ধর্ম্মকর্ম্মে লোকে এত আস্থাহীন ছিল না, বিশেষতঃ এরূপ সৎকার্য্যে ভদ্রলোক মাত্রেই অগ্রসর হইত, এখনকার মত ঘরে

খিল দিত না কিম্বা কোন অছিলা করিয়া এ সকল সৎকার্য্যে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করাও তখনকার লোকের স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। পুরোহিত রামানন্দের লোক সংগ্রহ করিতে বেশী বিলম্ব হইল না। সেই দারুণ শীতে সকলে "অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম" নাম শুনাইতে শুনাইতে ভুবনেশ্বরীকে গৃহের বাহির করিলেন। ভুবনেশ্বরী তাঁহার আজীবন সেবিত কালিকার মূর্ত্তি চর্ম্মচক্ষে উত্তমরূপে দর্শন করিয়া ক্ষীণহস্তে করযোড়ে প্রণাম করিলেন। মূর্ত্তিমধ্যে দেবী কালিকা যেন হাসিতে হাসিতে চির-সেবিকাকে চরণে স্থান দানের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভুবনেশ্বরী চলিয়া গেলেন—চিরতরে চলিলেন—আর ফিরিবেন না। আমিনা মন্দির-চত্বরে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মন্দিরে দেবী রহিয়াছেন, বালক দুইটী ঘুমাইতেছে, এখন তাহাদের চৈতন্য হয় নাই। মায়ার আধিক্য হইবে বলিয়া ভুবনেশ্বরী তাহাদের জাগাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। হায়! কাল চোর প্রবেশ করিয়া আজ তাহাদের কি নিধি হরণ করিল—বালক বালিকা একবার দেখিল না, বুঝিল না যে দুরন্ত কৃতান্ত আজ তাহাদের কি ভীষণ সর্ব্বনাশ সাধন করিল! নিদ্রে! অসামান্য কুহক তোমার; তোমার কুহকে পড়িলে মানুষের অবস্থার ব্যবস্থা থাকে না। কিন্তু তোমার চেয়ে কৃতান্ত-শয়ন ভীষণ নহে—যে শয়নে আজ ভুবনেশ্বরী শায়িতা! ত্রিবেণীর ঘাটে তীরস্থ করিবামাত্র ভুবনেশ্বরী ক্ষণকাল বাস করিয়া ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া যখন প্রাতঃকালে সকলে ফিরিয়া আসিল, তখন লোক-মুখে শুনিল—"আমিনা ধূলায় লুটাইতেছে, তাহার অবস্থা খারাপ," রামানন্দ ত্বরিত পদে পুনরায় কবিরাজ মহাশয়কে ডাকিয়া আনিলেন।

কিন্তু কবিরাজ আসিয়া যখন নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, তখন আমিনার শেষ নিশ্বাস বায়ুস্তরে মিশিয়া গিয়াছে। ষোড়শী পিতামহীর মৃত্যুতে ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে, দরিয়ার কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর যখন শুনিল—তাহাদের মাতৃসমা স্নেহময়ী আমিনাও তাহাদের ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন তাহারা সংজ্ঞাশূন্য হইল। রামানন্দ বিষম শোক-শেল-বিদ্ধ হইয়া আমিনার গতি করিবার জন্য লোক ডাকিতে গেলেন। সংবাদ শুনিবামাত্র বহু লোক ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইল। আমিনার ন্যায় সতী স্ত্রীর দেহ স্পর্শ করা ত পরম সৌভাগ্যের কথা। অযাচিতভাবে সকলে আসিয়া তাঁহাকে কবরস্থ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গোলযোগ।

"জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে"—ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই বুঝি ভগবান আজ দ্বারবাসিনী গ্রামে আপন লীলাস্রোত বিভিন্ন প্রকারে প্রবাহিত করিয়া দিলেন। পরম ধার্ম্মিক জমীদার মেহের আলীর জীবিতাবস্থায় যে গ্রামে সুখ-সমৃদ্ধির অবধি ছিল না, যাহার প্রবল পরাক্রমে এবং ন্যায়নিষ্ঠাগুণে স্বজাতি-বিজাতীয় সখ্যভাব সমস্বত্রে গ্রথিত হইয়া গ্রাম শান্তিময় করিয়া তুলিয়াছিল, আজ তাঁহার অপগমে, স্বর্গখণ্ড

হইবার কিছুদিন পরেই গ্রামে ঘোর অশান্তির অনল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, গ্রামবাসী নিরীহ প্রজাবৃন্দ গ্রাম ছাড়িয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিতে লাগিল।

ভগবৎ প্রেরণায় দেশে সময়ে সময়ে এক এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন,—যাঁহাদের পদার্পণে দেশ বা গ্রামে কেমন যে একটা ধর্ম্মের স্রোত, শান্তির কেমন যে একটা প্রীতিপ্রদ করুণ ছায়া পরিবিস্তৃত হয়—যাহার শীতলতায় বসবাস করিয়া লোক স্বর্গের সুখ অনুভব করে কিন্তু হায়! তাহা ত কই চিরস্থায়ী হয় না, সুখের পর দুঃখের ন্যায়, ধর্ম্মের পর অধর্ম্মের ন্যায়, শান্তির পর অশান্তির ন্যায়, জীবের ভাগ্যদোষে কোথায় সে কমনীয় ভাব অন্তর্হিত হইয়া কঠোরতার কালানল প্রজ্জ্বালিত করিয়া দেশকে ছারখার করিয়া ফেলে, আজ দ্বারবাসিনী গ্রামের ভাগ্যেও সেই দুর্দ্দিন উপস্থিত।

আদর্শ জমীদার মেহের আলীর সুশাসনে যে গ্রামে প্রজাবর্গের কোন প্রকার অভাব অভিযোগ ছিল না, দুঃখদৈন্য যে গ্রামের দিক দিয়াও যাইতে পারিত না, সূত্রপাত হইবা মাত্র যাহার প্রতিকার কল্পে জমীদার মহাশয় প্রাণপণে সেই দুষ্কৃতি নিবারণ করিতেন, আজ নবীন জমীদার নাযেজ আলীর শাসনাধীনে সেই গ্রামে হাহাকার রব উঠিয়াছে,-হিন্দু মুসলমান কেহ আর তথায় অবস্থানের প্রয়াসী না হইয়া গ্রাম পরিত্যাগ করিতেছে। নাজেম কাজির সহিত পরামর্শ করিয়া মেহেরের বেনামী বা হস্তান্তরিত যাবতীয় সম্পত্তি দখল করিতেছে। রামানন্দকে গোপনে হত্যা করিয়া দেব-সম্পত্তি সমস্ত হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে নানা প্রকার ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করিতেছে। দরিয়ার ও ষোড়শীর প্রতি তাহার কোপ-দৃষ্টি নিপ-

ভিত হইলেও তাহা তত কঠোর নহে। মেহের পালক পুত্র-কন্যা দরিয়ার ও ষোড়শীকে যে যৎসামান্য সম্পত্তি দিয়া গিয়াছিলেন—তাহা সে এখনও কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করে নাই। ঐ দুইটী বালক বালিকার ভালবাসা মাখান আকৃতি এবং তাহাদের কমনীয় প্রকৃতি দেখিলে অতি বড় পাষণ্ডের প্রাণেও দয়া হইত, তাহাদের ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না, এই নিমিত্ত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কঠোরভাব ধারণ করিলেও নাজেমের প্রাণ ত মনুষ্যোচিত উপাদানে গঠিত, তাই তাহার এক প্রান্তে বুঝি তিলমাত্র করুণা নিহিত থাকিয়া এই দারুণ অত্যাচারের হস্ত হইতে সেই নিরাশ্রয় বালক বালিকার অব্যাহতি প্রদান করিয়াছিল। আর তাহারা এখন অতি শিশু; দরিয়ার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর আর ষোড়শীর বয়স একাদশ বৎসর; এ অবস্থায় তাহারা এই অমিত প্রভাবশালী নাজেম আলীর কি অনিষ্ট সাধন করিতে পারে? তাহারা খেলায় ধূলায় কাল কাটায় সংসারের কুটিলতার পূতি-গন্ধ এখন উহাদের পবিত্র সরল হৃদয় কলুষিত করে নাই। মেহেরের পুরাতন ভৃত্য সওদাগর খাঁ এখন তাহাদের তত্ত্বাবধান করে, পুত্রনির্ব্বিশেষে লালন-পালন করে; সে আদর করিয়া বালককে দয়াফ খাঁ এবং ষোড়শীকে মতিয়া বেগম বলিয়া ডাকে; সে জানে ইহারা যখন জমীদারের দ্বারা পোষ্য পুত্ররূপে গৃহীত—তখন ইহারা মুসলমান; মুসলমান জাতীর মধ্যে এরূপ সুঠাম গঠন, সুন্দর প্রকৃতি ও অনুপম রূপ লাবণ্য সম্পন্ন বালক বালিকা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা খোদার অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টি; কালে ইহাদের দ্বারা মুসলমান সমাজ ধন্য হইবে, মুসলমান জাতির মুখোজ্জ্বল হইবে। একদিন না একদিন ইহারা

সৌভাগ্যশালী হইবে—ইহাদের যশঃসৌরভে ধরা পবিত্র হইবে; এমন রূপ-গুণের আধার শিশু কখন মন্দভাগ্য হইতে পারে না, ইহাদের প্রতিপালন করিলে আমারও যে একসময় সৌভাগ্য সঞ্চার হইবে, আমারও যে মান সম্ভ্রম বৃদ্ধি হইবে—তাহাতে আর সন্দেহ কি? সওদাগর শাস্ত্রপাঠী ধার্ম্মিক মুসলমান—এই আশাতেই সে প্রাণ দিয়া বালক বালিকার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। সে তাহাদের ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল, পরিধানের বসন ভূষণ মেহেরআলীর প্রদত্ত সেই ভূসম্পত্তি হইতে যোগাইতে লাগিল। পূর্ব্বে যেমন আহারাদি সম্বন্ধে ইহাদের একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল, কতকটা তান্ত্রিক হিন্দু হিসাবে যেমন ইহাদের আহারাদি চলিত, এখন আর তত বাঁধাবাঁধি রহিল না। তবে সওদাগর তাহাদিগকে অখাদ্য-কুখাদ্য খাওয়াইত না। দরিদ্রভাবে শাক-ডাল-ভাতেই তাহাদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। আর কেহ না থাকিলেও দরিদ্র সওদাগর এই বালক দুইটীকে লইয়া একরূপে হাসি খেলায় কাল কাটাইতে লাগিল।

রামানন্দের প্রতি নাজেম আলীর দারুণ আক্রোশ বশতঃ যখন সে তাহার জীবন নাশের সঙ্কল্প করিল, রামানন্দকে হত্যা করিয়া যখন দেবসম্পত্তি হস্তগত করিবার ইচ্ছা নাজেমের প্রবল হইল, তখন এক-দিন পুরোহিত রামানন্দ অন্ধকারময় গভীর রজনীযোগে তাঁহার প্রাণপ্রিয় কালীমূর্ত্তিটীকে লইয়া কোথায় পলায়ন করিল, কেহ তাহার সন্ধান করিতে পারিল না। নাজেম শত্রুতা সাধনের জন্য তাঁহার কত অনুসন্ধান করিল; এই সকল দুরভিসন্ধির কথা তাঁহার দ্বারা মুসলমান সমাজে পাছে প্রচারিত হইয়া পড়ে বলিয়া সে রামানন্দের

অন্বেষণে চারিদিকে গুপ্তচর পাঠাইল কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার দর্শন মিলিল না দেখিয়া সে অবশেষে হতাশহৃদয়ে দ্বারবাসিনীতে অপ্রতিহত প্রভাবে আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া বসিল। মেহেরআলীর পক্ষভুক্ত যে হিন্দু ও মুসলমানগণ এখানে বাস করিত—তাহারা পাষণ্ডের অত্যাচার প্রপীড়িত হইয়া বহুপূর্ব্বে পলায়ন করিয়াছিল। এক্ষণে এই গ্রামে নামেজ আলীর দলভুক্ত লোক সকল দলে দলে আসিয়া গ্রাম উজ্জ্বল করিয়া ফেলিল। অকর্ম্ম কুকর্ম্ম—অনাচার—ব্যভিচার-স্রোত প্রতিদিন গ্রাম প্রবাহিত করিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল; বাদ-প্রতিবাদ করিয়া বাধা দিবার কেহ রহিল না। নিরীহ সওদাগর দরাফ ও মতিয়াকে লইয়া গ্রামের প্রান্তভাগে সামান্য মাত্র কয়েকখানি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ন্যায় সুখে কাল যাপন করিতে লাগিল। যে জমীজমা ছিল, তাহাতেই এক প্রকার সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত; বাৎসরিক ব্যয়াদি করিয়া ক্ষেত্রোৎপন্ন যাহা উদ্বৃত্ত হইত, তাহা নিকটবর্ত্তী ত্রিবেণীর হাটে বিক্রয় করিয়া অপরাপর আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি খরিদ হইত। কিছুদিন পরে দরাফ ও মতিয়া যৌবন সীমায় উপনীত হইলে, সওদাগর তাহাদের বিবাহ দিয়া সংসারী করিয়া দিলেন। আমিনার প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য আজ তাহার দ্বারা সম্পাদিত হইল—বিধির বিধানে হস্তক্ষেপ করে এমন সাধ্য কার? পাঠক! এই দরাফ খাঁ ও মতিয়াই আমাদের গ্রন্থের প্রধান নায়ক নায়িকা—এখন হইতে আমরা তাহাদিগকে ঐ নামেই অভিহিত করিব।

যে দুইটী বিভিন্ন স্থান-সমাগত, অস্ফুটন্ত প্রণয় কোরক লীলাময়ের লীলাক্ষেত্রে পাশাপাশি হইয়া, প্রাণের বাঁধন ভালবাসার প্রগাঢ় সূত্রে

আবদ্ধ করতঃ আশার বাতাসে এতদিন বাড়িয়া উঠিতেছিল; সোহাগ-বিকাশে আত্মায় আত্মায় মিলিত হইবার প্রয়াস পাইতেছিল—ভবিতব্যের অকাট্য নিয়মে, বিধাতার অমোঘ বিধানে আজ তাহারা এক হইয়া গেল। মিলনের জন্য যে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা, একটা তীব্র তাড়না তাহাদিগকে এতদিন ব্যতিব্যস্ত করিতেছিল। আজ সুসময়ে পরিপুষ্ট প্রাপ্ত হইয়া সতেজ প্রভায় সংসার উদ্যান আলোকিত করিয়া তুলিল; যে দেখিল, যে শুনিল—সেই বলিল, মিলন রাজযোটক হইয়াছে। এমিলনে বিচ্ছেদ-গরল উত্থিত হইয়া প্রণয়ি-যুগলের প্রাণনাশের কোন সম্ভাবনা রহিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নিজদোষে।

দরাফ ও মতিয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছে; বিষয়-বৈভবে উত্তরোত্তর বেশ শ্রীসমৃদ্ধ হইতেছে দেখিয়া দুরাত্মা নাজেম আলীর অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল। এতদিন বালক বলিয়া অশ্রদ্ধা করিয়া সে তাহাদিগকে একপ্রকার ছাড়িয়া দিয়াছিল, কোন প্রকার শত্রুতাচরণে তাহাদের অনিষ্ট বা প্রাণহিংসার সঙ্কল্প করে নাই কিন্তু এক্ষণে তাহাদের উন্নতি দেখিয়া সে আর থাকিতে পারিল না। ক্রূরের ক্রূরান্তকরণে বিদ্বেষ বহ্নি যাহা এতদিন গুপ্তভাবে ধিক ধিক করিয়া

ভস্মাচ্ছাদিত ভাবে অবস্থিত ছিল, এক্ষণে মোসাহেবগণের ইন্ধন-বাক্যে প্রবল হইয়া উঠিল। সকলে যখন বলিল—সওদাগর হিন্দুরাজার সাহায্য লইয়া ধীরে ধীরে দরাফের বেশ ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেছে; কিছুদিন পরে হয় ত সে নাজেম আলী হইতে প্রবল পরাক্রমশালী হইয়া উঠিবে; একদিন হয় ত তাহার দ্বারা নাজেমের সকল প্রভুত্ব লোপ হইয়া যাইতে পারে।

অপরিণামদর্শী, কাণ্ডজ্ঞানহীন নাজেম এ কথায় অনাস্থা স্থাপন করিতে পারিল না, সে বুঝিল যাহা হউক, একজন প্রতিদ্বন্দ্বি ত বড় হইতেছে; কালে ত ইহার দ্বারা অনিষ্ট হইলেও হইতে পারে—অতএব ইহাকে আর বাড়িতে না দিয়া অঙ্কুরাবস্থাতেই মূলোচ্ছেদ করা উচিত। এইরূপ বিবেচনা করিয়া সে একদিন সওদাগরকে ডাকিয়া নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিল। দরাফের প্রতিপালক সওদাগর সেখও মুসলমান সেও কিছুতে হটিবার পাত্র নহে; সে আস্ফালন করিয়া বলিল—দেখ নাজেম! নানা প্রকার অন্যায় আচরণ করিয়া এক্ষণে বিপুল বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইয়া মনে করিয়াছ বুঝি তোমার পাপাচরণ চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে, চিরদিনই তুমি এইরূপ লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া অক্ষত শরীরে ধরাধামে বিচরণ করিবে, উপরে একজন পাপ পুণ্যের বিধানকর্ত্তা সর্ব্বদর্শী পুরুষ বিদ্যমান থাকিয়া আমাদের সমস্ত দেখিতেছেন, সমস্ত কর্ম্মের ফলাফল তাঁহার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে; একথা কি তুমি একদিনের জন্য চিন্তা কর না? তুমি নির্দ্দয়ভাবে স্বর্গীয় মেহেরআলীর যাবতীয় সম্পত্তি দখল করিয়া রাখিয়া কি মনে করিয়াছ—তোমার পতন হইবে না, তোমাকে কেহ পরাজয় করিতে পারিবে না? কিন্তু সেই সর্ব্বশক্তিমান্

খোদা একবার কটাক্ষ করিলে যে তোমার মত কতশত নাজেম মুহূর্ত্তে কোথায় লয় হইয়া যায় ; কৃতপাপের প্রতিফল এখনও কিছু পাও নাই বলিয়া বুঝি বক্ষঃস্থল সাহস বদ্ধ হইয়াছে ; দরাফ ও মতিয়া খোদার রক্ষিত তুমি নিশ্চয় জানিও নাজেম ! তাহাদের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে তোমার উৎসন্ন যাইবার ভেরী সত্বর বাজিয়া উঠিবে। অহরহঃ পাপ করিয়া কেহ ঠিক থাকিতে পারে না।

ধার্ম্মিক সওদাগর তীব্রতেজে এই সকল ধর্ম্মময় উপদেশ প্রদান করাতে নাজেমের অন্তর ধর্ম্মভাবাপন্ন হওয়া ত দূরের কথা, সে অপমানিত হইল ভাবিয়া বলিল—সওদাগর ! তুমি ত মেহের আলীর একজন হীন দাস ছিলে—ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, জ্ঞান বুদ্ধি ত তোমার নাই বলিলেই হয়—তুমি আবার কোন লজ্জায় নাজেম আলী হেন বুদ্ধিমানকে উপদেশ দিতে অগ্রসর হও, ইহাতে তোমার হৃদয়ে একটু ভয়ের সঞ্চার হইল না ? যাহা হউক, যদিও কিছু করিতাম না, বালকদের প্রতি দয়া করিতাম কিন্তু এক্ষণে তোমার বাক্যবাণ আমাকে অশেষ প্রকারে জ্বালাইয়া তুলিল—আজ হইতে দরাফের অনিষ্ট সাধন আমার মূল মন্ত্র রূপে পরিগণিত হইল। সওদাগর আর সহ্য করিতে পারিল না, রাগে তাহার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল—সে স্থান ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল—আচ্ছা, তোমার যতদূর ক্ষমতা থাকে করিও, খোদা আমাদের সহায় থাকিলে জগতে কাহাকেও গ্রাহ্য করি না।

সওদাগর আর দাঁড়াইল না, দ্রুত পদে সে পাপস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিল এবং পালক পুত্র দরাফ খাঁর সহিত নাজেম আলীকে বিধিমতে শাস্তি দিবার জন্য পরামর্শ করিতে

লাগিল। দরাফ ও মতিয়া কাহার সহিত বিবাদ করিতে বা কাহার মনে কষ্ট দিতে একান্ত নারাজ কিন্তু সওদাগর মিয়াও ত ধর্ম্মভাবে কিছুতেই তাহাদের অপেক্ষা হীন নহেন,—তিনি যখন এরূপ রাগান্বিত হইয়াছেন—তখন নায়েবের মতিগতি বড় ভাল নহে—অতএব পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ইহার পরদিন দরাফ খাঁ সওদাগরকে গৃহে রাখিয়া মহানাদ গ্রামের প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দুরাজা রণধীর সামন্তের শরণাপন্ন হইলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি,—সে সময় ত্রিবেণী হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূরে মহানাদ নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে উক্ত রণধীর সামন্তের রাজত্ব ছিল; রাজা পরম ধার্ম্মিক, অগ্নিহোত্র, দর্শ পৌর্ণমাস প্রভৃতি নানাবিধ পুণ্য কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিতেন; ইঁহার গৃহে হোমানল কখন নির্ব্বাণ হইত না; বহুশত ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণ ইঁহার যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিতেন; অতিথি সৎকার ইঁহার প্রধান কার্য্য ছিল; চতুর্হোত্র বিধি দ্বারা ইনি সর্ব্বদা ভগবানের আরাধনা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছিলেন; তথাপি জাতিধর্ম্ম প্রতিপালনের জন্য তিনি ক্ষত্রিয়োচিত রাজধর্ম্মও প্রতিপালন করিতেন। ধার্ম্মিককে রক্ষা করিতে, তাহার সকল কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিতে রণধীর সদা ক্ষিপ্রহস্ত; নির্লিপ্ত ভাবে এসকল কার্য্যে তিনি কোন দোষ বিবেচনা করিতেন না। ধার্ম্মিক যে জাতিই হউক না কেন—তাঁহাকে সাহায্য করিতে রাজা রণধীর বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন; এইজন্য ধার্ম্মিক যেহের আলীর সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল; মহম্মদ-ধর্ম্মে সুপণ্ডিত বলিয়া অযাচিত

ভাবে মেহের আলীকে তিনি পত্তনীদার নিযুক্ত করিয়া ছিলেন এবং সময়ে সময়ে তাহাকে লইয়া নানা প্রকার ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিতেন।

দরাফ খাঁ স্বর্গীয় মেহের আলীর পালিত পুত্র ও উত্তরাধিকারী এইরূপ পরিচয় পাইয়া তিনি তাহাকে সস্নেহে সম্ভাষণ করিয়া বসিতে বলিলেন এবং তাহার প্রমুখাৎ মেহেরের মৃত্যু হইতে অদ্যা-বধি সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলেন এবং তাহার প্রতি নাজেমের অত্যাচার অবিচারের বিষয় শুনিয়া পরম ধার্ম্মিক ন্যায়বান রাজার ক্রোধানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল; প্রিয় দর্শন দরাফ খাঁকে দেখিয়া কি জানি কেন তাঁহার প্রতি রাজার প্রাণ গলিয়া গেল; সেনাপতিকে তৎক্ষণাৎ প্রবল পরাক্রান্ত নাজেমকে শাসিত করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

সুন্দর দেহ, পরিস্কার গঠনপ্রণালী, ভালবাসা মাখান সুন্দর মুখমণ্ডল ভগবানের প্রীতির দান—এ জগতে যে সুন্দর হইয়া জন্মাইতে পারে—ভগবান যে তাহার উপর সদয়, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। ইহার উপর তাহাতে যদি আবার ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা থাকে—তাহা হইলে ত কথাই নাই, সোণায় সোহাগা সংমিশ্রণ; আর বাহ্যিক ভাল হইলে আভ্যন্তরিণ ভাল নিশ্চয় হইয়া থাকে, ইহার ব্যতিক্রম প্রায়ই হয় না। দরাফ খাঁ রাজার চিত্ত আকর্ষণ করিয়া কার্য্যোদ্ধার করতঃ বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। তৎপর দিন নাজেমের নিকট রাজদূত প্রেরিত হইলে অহঙ্কারী নাজেম সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিল এবং দরাফ খাঁ ও সওদাগরের প্রতি তাহার প্রতিহিংসা আসক্তি আরও বাড়িয়া উঠিল। কিন্তু উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার না হইলে ত আর কোন উপায় নাই।

নাজেম তিলমাত্র ভীত হইল না, কারণ যাবতীয় মুসলমান সমাজ তাহার স্বাপক্ষে; বিশেষতঃ নবাবের সহিত তাহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ—সে সামান্য রণধীর সামন্তকে দৃকপাত করিবে কেন? অচিরে সে নবাবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল কিন্তু কোন ফল হইল না। কারণ নবাব বহুদিন হইতেই নাজেমের প্রতি বিরক্ত হইয়া ছিলেন—সে অতিরিক্ত গোবধ করে, গো-কোরবাণিতে তাহার প্রবৃত্তি অত্যন্ত বেশী, এই জন্য নবাব তাহার প্রতি বিরূপ। গরু আমাদের দেশের প্রধান আবশ্যকীয় পশু; ইহার বধসাধন ধার্ম্মিক, শাস্ত্র-পাঠী নবাবের ইচ্ছা-বিরুদ্ধ—এই জন্য তিনি তাঁহার আত্মীয় ও রাজ্য মধ্যে এ সকল রহিত করিয়া ছিলেন। ইহা জানিয়াও যখন নাজেম এখনও তাহা করিতেছে, একথা তাঁহার কর্ণে পৌঁছিল;—তখন আত্মীয় বোধে কিছু না বলিয়া সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আজ সেই সুসময়ে নবাব তাহার বিপদে কর্ণপাত করিলেন না; বড় আশা করিয়া নাজেম নিরাশ হইল দেখিয়া সে বড়ই ভীত হইল, শত্রু শিয়রে উপস্থিত—এখন উপায়! নাজেম আলী মালদহে ফকীরের দলে আবেদন করিল; তখন ফকীরের দল খুব পুষ্ট ছিল—তাহারা স্বজাতির প্রতি বিজাতীয় রাজার আক্রোশ দেখিয়া আর থাকিতে পারিল না; নবাবের অনুমতি না লইয়া এবং বড় পীরের সিন্নি মানিয়া তাহারা রাজার সহিত যুদ্ধার্থ পাণ্ডুয়ায় আসিয়া শিবির স্থাপন করিল। নাজেম হিন্দু রাজার সুবিস্তৃত জমীদারীর লোভে বহু মুসলমান সৈন্য সহ ফকীরদলের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হিন্দু-যবন-সমর।

পৌরানিক তত্ত্বের অনুসন্ধানে জানা যায়—মহানাদ দেবপ্রতিষ্ঠিত গ্রাম। প্রবাদ আছে—এই গ্রামে দক্ষিণাবর্ত্ত একটী শঙ্খ পতিত হয় এবং তাহা বায়ুসংযোগে ভীষণ ধ্বনিত হইতে আরম্ভ করিলে, স্বর্গ হইতে দেবগণ আসিয়া তথায় জটেশ্বর শিবলিঙ্গ ও বশিষ্ঠ গঙ্গা নামে একটী সুবৃহৎ দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি শঙ্খের ঐ মহানাদ হইতে—এই গ্রামও মহানাদ নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ইহারই অন্তর্বর্ত্তী বশিষ্ঠ গঙ্গার তীরস্থ সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে যুদ্ধক্ষেত্র প্রস্তুত হইল।

অসংখ্য মুসলমান সৈন্যে সমরক্ষেত্র পরিবৃত হইল। যোদ্ধাগণ বহু আস্ফালন, ধাবন কুর্দ্দন করিতেছে, সেনাপতির অধীনে স্থানে স্থানে কুচ্ কাওয়াজ হইতেছে। রণধীর সেনাপতিকে রণে প্রবৃত্ত হইবার অনুমতি দিয়া স্বকার্য্যে অর্থাৎ ধর্ম্মকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। হিন্দু সেনাগণ আসিয়া "জয় প্রভু জটেশ্বর, জয় মা ভবানী" রবে আকাশতল প্রকম্পিত করিল কিন্তু তাহারা সংখ্যায় মুসলমান অপেক্ষা অতি অল্প; বিপক্ষ পক্ষ হিন্দু রাজার অতি ক্ষুদ্র বাহিনী দর্শন করিয়া আশায় উৎফুল্ল হইতে লাগিল। বিজয় লক্ষ্মী যে তাহাদের করতলগত হইবে, এ যুদ্ধে যে তাহারা জয়ী হইবে, রাজার ক্ষুদ্র শক্তি দেখিয়া তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লইল। পরদিন হইতে ঘোরতর সংগ্রাম

চলিতে লাগিল। হিন্দু সৈন্যগণ সকলেই শিক্ষিত—রণকৌশল তাহাদের বেশ অভ্যস্ত ছিল। মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা অধিক হইলেও বহু অশিক্ষিতে পরিপূর্ণ; তাহারা যাহা মনে করিয়াছিল, যে আশায় বুক বাঁধিয়া অতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল এক্ষণে মনোযোগের সহিত যুদ্ধ করিয়াও বেশী কিছু করিতে পারিল না।

ফকীর দলের মধ্যে একজন বিশিষ্ট লোক সেনাপতি পদে বরিত হইয়াছিল। সে দেখিল—হিন্দুর যে সৈন্যকে তাহারা পূর্ব্বদিন নিহত করিয়াছিল, আজ আবার ঠিক সেই ব্যক্তিই যুদ্ধ করিতেছে। রাজার সৈন্য এত অল্প এবং প্রত্যহ এত করিয়া নিহত করিয়াও তাহারা সৈন্য হ্রাস করিতে পারিতেছে না, যাহাদিগকে মারিয়া ফেলিয়াছে, পরদিনে আবার তাহারাই যুদ্ধে যোগদান করিতেছে দেখিয়া ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মুসলমান সেনাপতি হতবুদ্ধি হইয়া গেল। পরে যখন জানিতে পারিল যে বশিষ্ঠ গঙ্গার জল সেবনে হিন্দুর মৃত ব্যক্তি জীবন পাইতেছে, তখন তাহারা মালদহে বড় মোল্লার নিকট লোক পাঠাইল এবং উপায় অবধারণের যুক্তি পরামর্শ চাহিল। বড়মোল্লা বলিলেন—ঐ দিঘীর জলে গোমাংস নিক্ষেপ করিয়া জল অপবিত্র করা ভিন্ন উপায় নাই। তাহারা তাহাই করিতে আরম্ভ করিল কিন্তু যে যায় সে আর ফিরিয়া আসে না, কার্য্যসিদ্ধির পূর্ব্বেই রাজরোষে পড়িয়া শূলদণ্ড প্রাপ্ত হয়। পুনরায় বড় মোল্লার নিকট লোক গেল। তিনি বলিয়া দিলেন—গোপনে একার্য্য না করিলে হইবে না। মগরার নিকটবর্ত্তী হয়েড়া নামক স্থানে একজন ফকীর আছে, সে কামরূপী ইচ্ছা করিলে নানাপ্রকার বেশ ধারণ করিতে পারে, সে আমাদের দলভুক্ত, নাম রাজ মল্লিক, তোমরা তাহাকে এই কথা বলিলে বোধ হয় কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে।

মোল্লার আদেশ মত সেই গ্রামে লোক প্রেরিত হইল এবং রাজমল্লিককে স্বীকৃত করা হইল। রাজমল্লিক বলিল—স্বজাতীর মান রক্ষার্থে অবশ্য একার্য্য আমার করা উচিত কিন্তু ইহাতে আমার জীবনের আশা নাই। আমার যখন কেহ নাই, চাকরী গ্রহণ করিয়াছি—তখন একার্য্য আমি অবশ্যই করিব। তবে আমি মৃত হইলে তোমরা আমার নিজ গ্রামের নিকট কবর করিয়া দিও। এই বলিয়া রাজমল্লিক যোগীবেশে সজ্জিত হইল, মাথার জটায় গোমাংশ রক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে বশিষ্ঠ গঙ্গা অভিমুখে অগ্রসর হইল। রাজা যোগী সন্ন্যাসীর প্রতি কোন প্রকার অবিশ্বাস করিতেন না বরং তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে সম্মানিত করিয়া পূজা প্রদান করিতেন! রাজা রণবীর যোগীবেশী রাজমল্লিককে দীর্ঘিকা সমীপে যাইতে দেখিয়া কোনরূপ দ্বিরুক্তি করিলেন না। মনে করিলেন—প্রভু বুঝি কোন প্রকার গাত্র ধৌত মানসে জলে নামিতেছেন, যোগী গঙ্গায় অবতরণ করিয়া অবগাহন করিবামাত্রই ভীষণ ধূমস্তম্ভ উত্থিত হইতে লাগিল, রাম রাম শব্দে চারিদিক পূর্ণ হইয়া গেল, ঘন ঘন ভূমিকম্প হইতে লাগিল। রাজা অবস্থা দেখিয়া মুহূর্তমধ্যে গণক ডাকাইলেন এবং গণনায় যোগীকে ভণ্ড তপস্বী বলিয়া জানিতে পারায় তিনি তাহার প্রাণ সংহারে উদ্যত হইলেন। যোগীবেশী রাজমল্লিক বেগতিক দেখিয়া পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া উড্ডীয়মান হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু রাজার অব্যর্থ শর সন্ধানে বিদ্ধ হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার গ্রামে এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় পতিত হইয়া প্রাণ হারাইল এবং তথায় সমাহিত হইল। এখন গ্রামবাসিগণ তাহার নামানুসারে ঐ স্থানের নাম রাজমল্লিক তলা বলিয়া পরিচয় প্রদান করে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অকস্মাৎ এইরূপ দৈবদুর্ব্বিপাকে হিন্দুরাজা রণধীরের পরাজয় হইল বটে, মুসলমানগণ তাঁহার রাজ্য ও ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইল বটে কিন্তু তাহাদের তাহা বেশীদিন ভোগ করিতে হইল না। নাজেম আলীর কুপরামর্শে গৃহবিবাদ সংঘটিত হইয়া পুনরায় সমস্ত লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। ফকীরগণ শেষে নাজেমের কারসাজী বুঝিতে পারিয়া গোপনে তাহাকেই হত্যা করিল। রণধীর বন্দী হইয়াছিলেন—বড় মোল্লার আদেশে তাঁহার মুক্তিলাভ হইল। দরাফখাঁর কেশাগ্র কেহ স্পর্শ করিতে পারিল না। এরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়া, আত্মনির্য্যাতনের এরূপ অসহ্য কষ্ট স্বীকার করিয়া পরোপকার করিতে রণধীরের ন্যায় রাজা আজকাল কয়জন জগতে বর্ত্তমান আছেন ?

এই সময় হইতে দরাফ খাঁ রণধীরের সহিত পিতাপুত্র সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। মুসলমান হইলেও হিন্দুর কাজকর্ম্মে দরাফ খাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল, সে প্রত্যহই রাজার নিকট থাকিত, ধর্ম্ম উপদেশ শুনিত,—এই জন্য সকল বিষয়েই সে বেশ ধর্ম্ম পরায়ণ ছিল। কিন্তু প্রবৃত্তি তাহাকে সময়ে সময়ে দাগা দিত ; নিজে কর্ত্তা হওয়া অবধি সে মাংসাদি ভোজনে বড়ই প্রীত হইত, মতিয়ার এত উপদেশ, রাজার এত সৎশিক্ষা তাহাকে ঐ বিষয়ে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে নাই। এক একদিন নিজকে সে ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিল—হায় ! প্রবৃত্তি কেন এত প্রবল হইয়া উঠে। কেন মাংসাদি খাদ্যে মন বারণ মানে না !

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সংসারের সুখ।

অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র ভারতে কখন অন্নের জন্য কাহাকেও ভাবিতে হইত না। আমার সংসার কেমন করিয়া চলিবে, পুত্রকন্যা কেমন করিয়া সুখে সচ্ছন্দে থাকিবে, এ ভাবনা ভারতে কখন ছিলনা; এই সে দিনও ভারতে টাকায় আটমণ করিয়া চাউল বিক্রয় হইয়াছে। আমাদের দেশে লোকের আহার বিহারের কখন কোন কষ্ট বা অনাটন হইত না বলিয়াই তখন এদেশের লোক এত দাসত্ব প্রিয় ছিল না। দাসত্ব করিতে এদেশের লোক চিরকালই নারাজ, কাহার অধীনতা স্বীকার করিব, বিশেষতঃ শ্ববৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা অপেক্ষা মরণই মঙ্গল—ইহা সকলেরই ধারণা ছিল। অভাব ছিলনা বলিয়াই অধীনতা আমাদিগকে বশীভূত করিতে পারে নাই, তবে পূর্ব্বে হীন জাতি উচ্চ জাতীর সেবা করিত, সে দাসত্বের হিসাবে নহে—ধর্ম্মের হিসাবে, ব্রাহ্মণেতর জাতির দাস্যবৃত্তি নির্দ্ধারিত ছিল।

জাতীয় ব্যবসা তখন কেহ ছাড়িত না, ইহার দ্বারাই তখন দেশ উন্নত হইয়াছিল; মানুষ দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সুখে সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত। তখন পল্লীর শ্যাম-নিকুঞ্জে চঞ্চলা অচলা হইয়া বাস করিতেন; সকলেই মা লক্ষ্মীর কৃপায় উদর পুরিয়া আহার করিত, দশজন আত্মীয়কে প্রতিপালন করিয়া মনুষ্য নামের সার্থকতা সম্পাদন করিত। এখন বাটীতে একজন অতিথি আসিলে গৃহস্থ অস্থির হইয়া পড়েন, প্রকারান্তরে এখন তাহাদিগকে রিক্ত হস্তে তাড়াইবার ব্যবস্থাই

প্রতি গৃহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে কিন্তু পূর্ব্বে অতিথি "নারায়ণ" বলিয়া অতি সমাদরে গৃহস্থ তাহাদিগকে গৃহে আনিতেন—তাহাদের পূজার ব্যবস্থা করিতেন। এখন আমরা টাকা থাকিলেই নিজেকে সৌভাগ্য-শালী মনে করি, যাহার যত টাকা আছে, যত সঞ্চয় করিয়া লৌহ-সিন্ধুক পূর্ণ করিতে পারিয়াছে, সে তত বড়লোক, দশের নিকট তাহার তত মান-সম্ভ্রম, প্রসার-প্রতিপত্তি তত বেশী, কিন্তু পূর্ব্বে ধনের পরিমাণ এরূপ ভাবে হিসাব করা হইত না। নগত মুদ্রা তখন ধনের মধ্যেই পরিগণিত হইত না। কাহার কয়খানা লাঙ্গলের চাষ, কাহার গৃহ-প্রাঙ্গণে কতগুলি ধান্যের মরাই বাঁধা আছে, গোলায় কত ধান মজুত আছে, ইত্যাদি হিসাব করিয়া তখন লোক বড়লোক আখ্যায় আখ্যা-য়িত হইত। যাহার এই সকল যত বেশী সে তত বড়লোক, সমাজে তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তি তত অধিক। তখন এইরূপ হইলেই সংসার সুখের হইত, আধুনিক সমাজে এই সকল বিষয় বৈভব আর বড়লোকের নিদর্শন নহে। এখন টাকাকড়ি, কোঠাবাড়ী, গাড়ীঘুড়ি না থাকিলে তাহাকে কেহ মানে না, সমাজে আধিপত্য বিস্তার করিতে হইলে এ সকল একান্ত আবশ্যক। পূর্ব্বকার ভাব এখন চাষার ভাব বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; সে সকল বড় লোককে এখন চাষা বড় লোক বলিয়া সভ্য সমাজ ঘৃণায় নাশিকা কুঞ্চিত করে। কিন্তু স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিতে গেলে প্রকৃত বড় লোক কে—তাহা বুঝিতে পারা যায় —"এই গৃহলক্ষ্মীর আবাস ভূমি" বলিতে গেলে, ধনরত্ন সমন্বিত ধনী ব্যক্তিকে বুঝায় না; ধন সকল সময়ে মানুষকে রক্ষা করিতে পারে না—ধন অভাব মোচন করিতে সকল সময়ে সমর্থ নহে। যখন দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়,—খাদ্য-ধান্য যখন দেশে আদৌ পাওয়া যায় না—

তখন যাহার মরাই বাঁধা ধান আছে, সেই বড় লোক—সেই অভাবের হস্ত হইতে পরিমুক্ত,—না যাহার লৌহ সিন্দুকে অজস্র রত্ন সঞ্চিত আছে—সে বড় লোক ? শুনিতে পাওয়া যায়—ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে একমুষ্টি চাউলের বিনিময়ে লোকে সোণা রূপা, টাকা কড়ি অকাতরে প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। যাহার ঘরে গোলা পূর্ণ ধান ছিল—তাহারই জয় জয় কার হইয়াছিল। এই জন্য তখনকার লোক টাকার প্রতি তত আকৃষ্ট হইত না। চাষ আবাদেই বেশী মনোযোগ দিত।

আমাদের দরাফ খাঁ সামান্য গৃহস্থ হইলেও তাহার দুইখানি লাঙ্গলের চাষ ছিল; প্রতিবৎসর ধান্য গোলাজাত হইয়া তাহাদের অভাব পূরণ করিত। একজন রাখাল বালক তাহাদের সহায়তা করিবার জন্য নিযুক্ত ছিল, সওদাগর ও দরাফখাঁ স্বয়ং ক্ষেত্রের কার্য্য তত্ত্বাবধারণ করিত। তখন ধান্য আদান প্রদানেই সংসার চলিত; যাহা আবশ্যক হইত—ধান্য পরিবর্ত্তন করিয়াই তাহা পাওয়া যাইত, কাজেই টাকার আবশ্যক হইত না; আবশ্যক হইলে উদ্বৃত্ত ধান্য হাটে বিক্রয় করিয়া সে অভাব পূর্ণ হইত, তবে তখন টাকা যে অত্যন্ত মহার্ঘ ছিল, সে বিষয় সন্দেহ নাই; আটমণ ধান্য প্রদান করিলে তবে একটী টাকা পাওয়া যাইত, আর এখন আট টাকা প্রদান করিলে তবে একমণ চাউল পাওয়া যায়। ইহাতেই পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন—এখন টাকার বাজার কত সস্তা হইয়াছে। তখন পাঁচ টাকা উপার্জ্জন করিতে যে পরিশ্রম হইত, এখন বোধ হয় একশত টাকা উপার্জ্জন করিতেও তত কষ্ট হয় না! হায়! একালে আর সেকালে আকাশ পাতাল প্রভেদ হইয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে সজাতীয় বৃত্তির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া অনুমান হয়।

দরাফ খাঁ একজন উচ্চবংশোদ্ভব মুসলমান জমীদারের পালক পুত্র, লেখাপড়া শিক্ষাও তাঁহার নিতান্ত মন্দ ছিল না। সওদাগরের তত্ত্বাবধানে তিমি পার্সী, হিন্দি বেশ শিখিয়াছিলেন, সম্প্রতি রাজা রণধীরের সহিত পরিচিত হইয়া, সদাসর্ব্বদা তাঁহার রাজধানীতে অবস্থান করিয়া সামান্য বাঙ্গলা এবং সংস্কৃতও অভ্যাস কয়িয়াছিলেন। রাজা মহারাজার ঘরের যুবক অপেক্ষা বাহ্য সৌন্দর্য্যেও তিনি উৎকৃষ্ট ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তথাপি তিনি চাষ আবাদের কাজ দেখিতেন; পায়ে কাদা লাগিবে বলিয়া, কৃষাণদের সহিত মাঠে রৌদ্র-তাপ সহ্য করিতে হইবে বলিয়া এসকল কার্য্যে তিনি পশ্চাৎ পদ হইতেন না। তাঁহার পিতৃতুল্য মেহের আলী যখন লোকাভাব হইলে একার্য্যে অগ্রসর হইতেন, তখন তিনি না করিবেন কেন! সওদাগর মিয়া তাঁহাকে এসকল শিক্ষা দিতে কিছুমাত্র ক্রটী করে নাই, বলিত—বাবা! এসকল ঘরের কাজ, না করিলে চলিবে না, ইহাতে লজ্জা করা মানুষের কাজ নয়। সংসারে যুবতী মতিয়া—অপরূপ রূপলাবণ্যবতী হইলেও গৃহকর্ম্ম একাকীই সমস্ত সম্পাদন করিতেন—সহায়তার জন্য একজন দাসীমাত্র নিযুক্ত ছিল বটে কিন্তু সে এত বয়স্থা যে মতিয়া দয়া পরবশ হইয়া তাহাকে বেশী খাটিতে দিতেন না, তাহার অধিকাংশ কাজ আপনার গৃহ-কর্ম্ম সারিয়া নিজেই সমাধা করিয়া দিতেন। যুবতী মতিয়ার সুশৃঙ্খলায় সংসার পরিচালনার-গুণে দরাফ খাঁর সংসার ধনধান্যে এরূপ পূর্ণ হইয়াছে, সুখ স্বচ্ছন্দের আকর হইয়া এত অল্প দিনের মধ্যে এরূপ শান্তিময় হইয়া উঠিয়াছে। মতিয়া স্বহস্তে পতির পরিচর্য্যা করিতেন,—তাঁহার আহারাদি প্রস্তুত করিয়া দিতেন; আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যথাস্থানে সজ্জিত করিয়া রাখিতেন—স্বামীকে তাহার জন্য

কাহার মুখাপেক্ষা করিতে হইত না; তারপর পূজনীয় সওদাগর ও পোষ্যবর্গ এবং দাসদাসীগণকে আহার করাইয়া নিজে আহার করিতেন। দরাফের গৃহে প্রত্যহ অতিথি সৎকার হইত—যে দিন অতিথি না আসিত—সে দিন পাড়ায় ডাকিতে লোক পাঠাইতেন—একান্ত না পাইলে সে দিন পতি পত্নী নিজেদের সৌভাগ্যহীন মনে করিয়া আহারে সুখ বোধ করিতেন না—সমস্তদিন কেমন একপ্রকার বিমনা হইয়া কাল কাটাইতেন। বাল্যকালের ক্ষীণস্মৃতি তাঁহাদিগকে কালে এইরূপ অভ্যাসেই অভ্যস্থ করিয়াছিল। তখন আমাদের দেশে কোন জাতীয় স্ত্রীলোকেই এখনকার মত অলঙ্কারের আদর জানিত না বা অলঙ্কারের প্রচলন মধ্য-বিত্ত-সমাজে এত প্রবল ছিল না। সর্ব্বাধিক ঐশ্বর্য্যশালী জমীদার না হইলে—কেহ অলঙ্কার ব্যবহার করিত না। যদি কেহ বালক বালিকাদের জন্য বা বিবাহিত রমণীর জন্য করিত—তাহাও রৌপ্য নির্ম্মিত, সুবর্ণের অলঙ্কার তখন আমীর ওমারাহ ভিন্ন কাহার স্ত্রীলোকের অঙ্গ-শোভা বর্দ্ধন করিত না। মোট কথা হাব ভাব বা বাজে বিলাসিতা তখন কোন জাতীয় ভদ্র গৃহস্থ পছন্দ করিতেন না। যুবতী মতিয়া—সৌন্দর্য্যের আধার মতিয়া—রূপগুণ মণ্ডিতা মতিয়ারও সেইজন্য কোন অলঙ্কার ছিল না, ইহার জন্য তিনি কখন স্বামীকে কোন কথা বলেন নাই বা বলিতে হয় বলিয়া তাঁহার ধারণাও ছিল না। ব্রহ্মচারিণীর অনুকরণে অভ্যস্থা মতিয়ার এসকল বিষয়ে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইত। ধর্ম্মই সকলের সার, সকল সৌন্দর্য্যের আধার, বাল্যের এই শিক্ষার ক্ষীণ স্মৃতিই তাঁহাকে জীবন-মধ্যাহ্নে এ সকল বিষয়ে এত উদাস করিয়া রাখিয়াছিল। তথাপি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে গৃহকর্ম্ম সমস্ত সমাধা করিয়া নীলাম্বরী সাড়ী খানি পরিয়া মতিয়া

স্বামীর অপেক্ষায় যখন গৃহের বহির্ভাগে কদম্বমূলে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, উচ্ছৃঙ্খল প্রচণ্ড পবন যখন সোহাগভরে তাঁহার চূর্ণ কুন্তলদাম লইয়া কখন সুন্দর বদনের চারিধারে কখন চক্ষে কর্ণে ছড়াইয়া খেলা করিত তখন তাহাকে দেখিয়া বৃন্দাবনবিহারিণী রাই কিশোরী বলিয়াই সকলেরই ভ্রম হইত; বাস্তবিক তাহার সৌন্দর্য্য শোভা দেখিলে দেবী প্রতিমা ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইত না। মানবীর একাধারে এত রূপ—তাহার সহ নানাবিধ গুণের একত্র সমাবেশ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এহেন কোমলতাময় গাত্রে অলঙ্কারের শোভা তাহার ঈশ্বরদত্ত সৌন্দর্য্যের হ্রাস ভিন্ন বর্দ্ধিত করিতে পারে না।

বাল্যকাল হইতে যে ভালবাসা বদ্ধমূল হয়, হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে প্রিয়তমের জন্য, বাঞ্ছিত বস্তুর জন্য যাহা ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইয়া মহান্ মহীরুহে পরিণত হয়, তাহার শীতল ছায়া প্রণয়ীকে যেরূপ ভাবে পরিতৃপ্ত করে, যৌবনের ভালবাসা ঠিক সেইরূপ ভাবে, সেইরূপ প্রাণেপ্রাণে মাখামাখি হইয়া ভালবাসিতে পারে না। যৌবনের ভালবাসা একটা তীব্র জ্বালাময় আকাঙ্ক্ষা লইয়া বাঞ্ছিতকে ভালবাসে—আর বাল্যের ভালবাসায় সে ভাব নাই—নিঃস্বার্থভাবে আত্মদান করিলে জীবের প্রতি জীবের যে ভাব, যে আগ্রহ, যে ঐকান্তিকতা আসে এ ভালবাসা তাহাতেই গঠিত; ইহার স্রোতে হৃদয়-নদী চিরদিন কূলে কূলে ভরা, জুয়ার ভাটায় টানাটানি পড়ে না। প্রিয়বস্তুকে ভালবাসা যেন তাহার কাজ, এ কাজ যে,তাহার জীবনের সহিত সংবদ্ধ, না বাসিয়া থাকিতে পারে না, তাই এ ভালবাসায় দাসীত্বের ভাব, মাতৃত্বের ভাব, গুরুত্বের ভাব অবস্থা বিশেষে প্রকাশ পায়। দরাফের সহিত মতিয়ার ভালবাসা এইরূপই ছিল।

দরাফ সওদাগরের সহিত প্রত্যহ ক্ষেত্রে যাইতেন—রাখালদের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের ব্যবস্থা করিয়া বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় বাটী আসিয়া স্নান করিতেন—নমাজ পড়িতেন। মতিয়া প্রাতঃকালে দাসীর সহিত গৃহকর্ম্ম সমাধা করিয়া সকলের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া পরে তাহার প্রিয়তমের জন্য অতীব সন্তর্পণে আহারাদি প্রস্তুত করিতেন। স্বামী কোনটী খাইতে বেশী ভাল বাসেন, কোনটী আহার করিলে তাঁহার হৃদয়ে তৃপ্তি বোধ হয়—কোন অসুখ বোধ করেন না; মতিয়া প্রত্যহ অভিনিবেশ সহকারে ঠিক তাহার রুচি অনুসারে বাছিয়া বাছিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। নমাজ শেষ হইলে স্বামীকে ও সওদাগরকে আহার করাইতেন—এই সময়ে তাঁহার মাতৃত্বের ভাব পরিস্ফুট হইত, তারপর আত্মীয় পরিজনের ভোজনান্তে তিনি আহার করিয়া স্বামী যখন বিশ্রাম করিতেন—তখন আস্তে আস্তে শয্যাতলে অবস্থিতা হইয়া পাখার বাতাস করিতেন, গাত্রে হাত বুলাইয়া দিতেন, দাসী ভাবে ইহা তাঁহার নিত্যকর্ম্ম ছিল। পল্লীগ্রামে অনেকস্থলে রজনীর আহার প্রায় প্রচলিত নাই। অজস্র গো-দুগ্ধের সাহায্যে জলযোগের ব্যবস্থাই তখন হইয়া থাকে, এ ধার্ম্মিক মুসলমান গৃহেও তাহাই অব্যাহত ছিল। রজনী যোগে আহারাদি করিয়া মতিয়া অবার পূর্ব্বমত প্রকারে স্বামীর সেবা করিতেন, সেবা করিতে করিতে কথায় কথায় বলিতেন—দেখ, অতি-রিক্ত মাংসাহার গুলো তুমি ত্যাগ কর, ওগুলো খেতে ভাল লাগে বটে কিন্তু আমার বোধ হয় ওতে দেহের বেশী উপকার হয় না, ঠাক-রুণ বল্‌তেন—আমাদের দেশে ও খাওয়াগুলো ত্যাগ করাই ভাল, তাই তিনি আমাকে ও সব খাইতে দিতেন না—সেই হতে আমার ঐ সকলে অত্যন্ত বিতৃষ্ণা হয়ে গেছে; তবে তুমি ভালবাসো, না করলে চলে

না, তাই ইচ্ছা না থাকলেও করতে হয় কিন্তু অসার মাংসের সহিত প্যাঁজ রুসুনের গন্ধ গুলো আমার নাকে যেন কেমন কেমন লাগে।

দরাফ স্ত্রীর কথা শুনিয়া একটু অপ্রতিভ হইতেন, মতিয়ার যাহাতে কষ্ট হয়, তাহার আচরণ করা তিনি ভাল বিবেচনা করিতেন না কিন্তু প্রবৃত্তি তাহার আদৌ নষ্ট হয় নাই, এত চেষ্টা করিয়াও কই সে ত তাহা ছাড়িতে পারে না। অতিরিক্ত পরিশ্রম জন্য সামান্য পরিমাণে দেশী সুরাও গোপনে ব্যবহার তাঁহার অভ্যস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু মতিয়া ভিন্ন এ বিষয় আর কেহ জানিত না এবং তাহাতে দরাফের কোন বিকার উপস্থিত হইত না বরং তাহাতে স্বামীর শ্রমের লাঘব হইত, শরীর সুস্থ থাকিত বলিয়া মতিয়া কিছু বলিতেন না। ইহার জন্য মতিয়ার স্বামিভক্তির তিলমাত্র ব্যতিক্রমও হয় নাই—তবে সময় পাইলে, স্বামীকে বেশ ভাল অবস্থায় দেখিলে মতিয়া সময়ে সময়ে গুরুরূপে তাহাকে উপদেশ দিতেও ছাড়িতেন না। /পত্নীর উপদেশ বাণী তাহার প্রাণে প্রাণে লাগিত কিন্তু কি জানি সে তাহা ছাড়িতে পারিত না, হায়! প্রবৃত্তি যাহার প্রতিকূলে, নিবৃত্তি তাহার কেমন করিয়া আসিবে।

পল্লীগ্রামে হিন্দুদের সহিত মুসলমানদেরও বেশ সদ্ভাব সংস্থাপিত থাকে; কেহ খুড়া, কেহ মামা, কাহাকেও বা ঠাকুর বলিয়া মুসলমানগণ বয়স বিশেষে হিন্দুদের সম্বোধন করিত,—তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিত; কাজকর্ম্মে নানাপ্রকারে সহায়তা করিতে ত্রুটী করিত না। হিন্দুরাও তাহার বিনিময় প্রদান করিয়া পল্লীমাঝে বেশ সদ্ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। পল্লীগ্রামে এখন এভাব বিদূরিত হয় নাই। হিন্দু মুসলমান পরিবেষ্টিত পল্লীগ্রামে এখন এরূপ আদান-প্রদান নয়নের সম্মুখে

বিদ্যমান রহিয়াছে। দ্বারবাসিনী গ্রামে অনেক হিন্দুর বাস ছিল—দরাফ তাহাদের সহিত মিশিত, তাহাদের উপদেশ শিরোধার্য্য করিত, প্রকৃতি কিছু উগ্র হইলেও মানীর মান সে রাখিতে অভ্যস্থ ছিল বলিয়া সকলেই তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিত। মতিয়া সংসার কার্য্য সারিয়া সময় পাইলে প্রতিবাসী গৃহে আসিয়া সমবয়সীদের সঙ্গে সময়ের খেলা খেলিত, আবার সময়ে সময়ে গৃহীনীদের নিকট কিছু ধর্ম্ম কথা শিখিয়া লইয়া তাহার সার সংগ্রহ করিত; কখন বা তাহাদের অজানিত দুই চারিটা ধর্ম্ম কথা কহিয়া তাহাদের প্রীতি উৎপাদন করিত। মতিয়াকে পাড়ার স্ত্রীমহলে সকলেই ভাল বাসিত, সকলেই তাহাকে আপনার করিয়া লইবার জন্য বলিত—"আহা! এমন মেয়ে কেন মুসলমানের ঘরে জন্মালো—যদি হিন্দুর ঘরে জন্মাইত—তাহা হইলে প্রাণ খুলিয়া তাহার সহিত আহার-বিহার করিয়া কত আনন্দ পাওয়া যাইত। মতিয়ার আচার-ব্যবহার কিন্তু হিন্দুদের অপেক্ষা হীন ছিল না এবং অনেকানেক হিন্দুরমণী তাহার এক একটী জ্ঞানগর্ভ কথায় স্তম্ভিত হইয়া যাইত, তাহারা অম্লান বদনে বলিত—এমন মেয়ে আমাদের ঘরেই কয়টা আছে? মতিয়াকে কেহ কখন দুঃখিত দেখে নাই; তাহার বদন কখন বিরস ভাবে তাহার দেহের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিত না—সে মধুর অধর সদাই হাস্যযুক্ত থাকিয়া তাহার চন্দ্রবদনের শোভা বর্দ্ধন করিত। আর দরাফের ত কথাই নাই, মুসলমান যুবক চিরআনন্দময়, তাহার হৃদয়ে কোন প্রকার কুটিলতা স্থান পাইত না, রাজসিক আহার করিত বলিয়া প্রকৃতি কিছু উগ্র হইলেও সদ্বিষয়ে তাহা এত মৃদুতা অবলম্বন করিত, কঠিনে কমনীয়তার সংমিশ্রণ হওয়ায় তাহা এত রমনীয় ভাব ধারণ করিত যে তাহার পরিণাম পুরস্কার অজস্র সাধুবাদ ভিন্ন আর কিছু নহে।

স্পষ্ট কথা বলিতে সে কষ্ট বোধ করিত না, হৃদয়ে যাহা ভাল বলিয়া বোধ হইত—তাহা সে তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করিয়া দিত, কোন প্রকার ইতস্ততঃ করিত না। ভিতরে এক রূপ রহিয়াছে—বাহিরে একরূপ বলিতেছে—ভাবের ঘরে এরূপ চুরি করা তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল; স্থান বিশেষে যদি সে কথায় লোকের অনিষ্ট হইবে বলিয়া মনে করিত—তবে সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইত,তথাপি তথায় আর অবস্থান করিত না। পতি পত্নীর গুণে শুধু মুসলমান সমাজ কেন—হিন্দু সমাজ পর্য্যন্তও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। দুইটী প্রাণ যেন এক সূত্রে গাঁথিয়া গিয়াছিল—মতিয়া ও দরাফ ভিন্ন মূর্ত্তিতে যেন একাঙ্গ, এক হৃদয় একভাবে অনুপ্রাণিত, নদী সাগরে আত্মসমর্পণের ন্যায় ঠিক একাকার হইয়াছিল, কাহার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না, তবে প্রবৃত্তির তাড়নায় সাগর সময়ে সময়ে উর্ম্মী সংক্ষেপিত হইত মাত্র।

দ্বারবাসিনী গ্রামে এই আদর্শ মুসলমান দম্পতী মহিমাময় খোদা-তাল্লার অনুগ্রহে ধর্ম্মের সংসার পাতিয়া শান্তি-সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। কালক্রমে দেবতার আশীর্ব্বাদে একটী দেবদূত তাহা-দের শান্তি-সুখের অগ্রভাগ গ্রহণ করিবার জন্য অংশীদার রূপে অবতীর্ণ হইল। দরাফ ও মতিয়া এই ভবিষ্যৎ আশার ধন, নয়ন-নন্দন পুত্ররত্ন লাভ করিয়া মানব জীবন ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

ভুতের কথায়।

প্রমোদ-উদ্যানে মধুপ ঝঙ্কারের ন্যায় সংসার-কাননে পুত্র-কন্যার কলকণ্ঠধ্বনি শ্রবণ গোচর না হইলে সংসারীর সুখ বর্দ্ধন হয় না, সংসারেরও কোন প্রকার শোভাও থাকে না। যে সংসার বালক বালিকার কোমল কণ্ঠস্বরে মুখরিত না হয়, তাহাকে সংসার বলিতে পারা যায় না। দরাফ ও মতিয়ার যৌবন সীমা প্রায় উত্তীর্ণ হইল তথাপি তাহাদের পুত্রাদি হইল না দেখিয়া সওদাগর দেবতার স্থানে গো-গোরবাণী মানত করিয়াছিল। সওদাগরের বড় ইচ্ছা যে তাহার পালিত পুত্র ও বধুর একটী পুত্র হউক, সে তাহাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিবে বালকের সহিত বালক সাজিয়া আনন্দে দিন কাটাইবে তাই সে খোদার স্থানে প্রার্থনা করায় বুঝি তিনি আজ দয়া করিয়াছেন, স্বর্গের একটী দেবদূত পাঠাইয়া তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন।

ঈদ্‌পর্ব্ব নিকটবর্ত্তী, আর বেশী বিলম্ব নাই বলিয়া সওদাগর একদিন দরাফকে সম্বোধন করিয়া বলিল—দেখ দরাফ! একটী খোকা হইবার জন্য আমি আল্লার কাছে গো-কোরবাণী মানত করিয়াছিলাম। আগামী ঈদ্‌পর্ব্ব উপলক্ষে তাহা প্রদান করিতে হইবে। দরাফ্ শুনিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিল, সে একে বড়ই মাংসপ্রিয় তাহাতে আবার দেবতার উদ্দেশে দেওয়া হইবে, তাহা হইলে মতিয়া

আর কোন আপত্তি করিতে পারিবে না, এই ভাবিয়া সে আনন্দে সম্মতি প্রদান করিয়া বলিল—চাচা! তার আর কথা কি; যখন আপনি মানসিক করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই দিব। মতিয়া কিন্তু প্রতিবাদ করিয়া বলিল—জীবের জন্য জীববলি বিশেষতঃ গো-কোর্ব্বাণী, কখনও হইতে পারে না। চাচা মহাশয়! আপনি অন্য ব্যবস্থা করুন, তাহাতে খোদা নারাজ হইবেন না। গো-কোর্ব্বাণী যে আমরা করি—তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, আর ইহা হিন্দুর পাড়ায় কখন হইতে পারে না, তাহা হইলে সকলেই আমাদের প্রতি বিরূপ হইবে, এমন কি আমাদের শত্রুতা সাধন করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না; যখন হিন্দুদের সহিত আমাদের এত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, তখন কেবল উদর পূর্ত্তির জন্য এত বড় একটা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ করা কখন উচিত নয়, ইহাতে খোকার আমার অকল্যাণ হতে পারে। আপনি বরং ইহার জন্য দিল্লীতে আবেদন করুন। তাহারা কি মত দেন—দেখুন।

মতিয়া স্বামী ও চাচার নিকট যেরূপ আগ্রহের সহিত কথাটী বলিল তাহাতে তাহাদের আর দ্বিরুক্তি করিবার ক্ষমতা রহিল না, তাঁহারা মতিয়ার কথানুসারে "গো-কোর্ব্বাণী করা উচিত কি না" জানিবার জন্য নবাব সরকারে আবেদন করিলেন। পাছে ভবিষ্যতে কোন একটা গোলযোগ উপস্থিত হয় বা ধর্ম্মে কোন প্রকার পতিত হইতে হয়—এই ভয়ে পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া উচিত। তখন হিন্দু মুসলমানে দিল্লীর বাদসাহকে "দীল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া মান্য করিত, দিল্লীতে তখন শাজাহানের রাজত্ব, সেখান হইতে যা আদেশ হইবে—তাহাই শিরোধার্য্য। কিয়দ্দিন পরে সংবাদ আসিল—"না ঈদ্ পর্ব্ব উপলক্ষে কেহ গো-কোর্ব্বাণী করিতে পারিবে

না, গরু আমাদের দেশের অতীব উপকারী এবং প্রিয় জন্তু, ইহা না থাকিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না, এই জন্য গো-কোর্ব্বণী শাস্ত্রনিষিদ্ধ, ইহার প্রচলন কোনও মতেই হইতে পারে না।” দীল্লীশ্বরের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সওদাগর আল্লার নিকট একটী বকরী কোরবাণী দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল।

মতিয়া একটা মহা চিন্তার হাত এড়াইল। খোদা তাহার খোকাকে নিরাময় করুন; তিনি কি তাঁহার সৃজিত জীবের নিকট ঘুষের প্রত্যাশা করিয়া কাহাকে জীবিত, কাহাকে মৃত বা কাহার দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য বিধান করেন, তিনি কি ঘুষখোর, তিনি যে দয়াময় দীনতারণ।

হইবে না হইবে না করিয়া ভগবানের কৃপায় দরাফের একটী পুত্রসন্তান হইয়াছে, এইজন্য আত্মীয় স্বজন তাহার নিকট একটা রীতিমত ভোজের প্রার্থনা করেন, ইহার জন্য অনেকে অনেকবার তাহাকে তামাসাও করিয়াছে। অভীষ্টসিদ্ধি হইলে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের প্রীতি সম্পাদন সকলেই করিয়া থাকে। দরাফও সওদাগরের সহিত পরামর্শ করিয়া আগামী বকরীদের দিন তাহাদের আপ্যায়িত করিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে দরাফকে প্রায় দুই শতাধিক নগদ মুদ্রা সংগ্রহ করিতে হইবে। হিন্দু বন্ধু বান্ধবকেও অনেক টাকা নজর দিতে হইবে। আর রাজ সরকারে কিছু উপঢৌকন না দিলেই কি ভাল দেখায়, একে রাজা রণধীর তাহাদের জমীদার, তাহার উপর বিপদের সহায়। সেখানে কিছু বিশেষভাবে উপঢৌকন দেওয়া উচিত, ইত্যাদি প্রকারে হিসাব করিয়া দুই শতাধিক নগদ মুদ্রা সংগ্রহের আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। কিন্তু নগদ মুদ্রা ত হাতে বেশী নাই, তাহারই এখন একান্ত অভাব।

কিন্তু যাহার গোলাভরা ধান আছে তাহার মুদ্রার অভাব কি ? বরং এমন সময় হইতে পারে যে মুদ্রা বিনিময়ে ধান পাওয়া না যাইতে পারে। কিন্তু ধান্য বিনিময়ে মুদ্রার অভাব কোথায়! শুভদিনের আর বেশী বিলম্ব নাই; দরাফ পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া একগোলা ধান ত্রিবেণীর হাটে বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলেন। কয়েক গাড়ী ধান বোঝাই করিয়া হাটে চালান দিল এবং অবশিষ্ট একটী বলদের পৃষ্ঠে ছালা বাঁধিয়া নিজে লইয়া গেল। সমস্তদিন অনাহারে দরাফ হাটে গিয়া দর যাচাই করিতে লাগিলেন। সে দিন হাটে অতিরিক্ত লোক সমাগম হইয়াছে, পূজার পূর্ব্বে এই শেষ হাট কাজেই লোকে লোকারণ্য, দেশ বিদেশ হইতে ত্রিবেণীর বন্দরে নানাবিধ মাল আমদানী হইয়াছে। কত মহাজন, কত ক্রেতা বিক্রেতা যে আজ এখানে সমাগত তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। হিন্দু মুসলমানের জনতার কলরবে কাণ পাতা যায় না। সমস্তদিন মাল যাচাই করিয়া সন্ধ্যার সময় দরাফ খাঁ একজন মহাজনকে সমস্ত মাল উচিত মূল্যে ছাড়িয়া দিলেন। গোযান দুইখানি গৃহে ফিরিয়া আসিল। দরাফ খাঁর টাকা কড়ি বুঝিয়া লইতে রাত্রি অনেক হইল। তখন লোকজনের কলরব অনেক কমিয়া গিয়াছে; হাটে আর লোকজন নাই; হাট যেমন জমিয়াছিল, বন্দর যেমন লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল, হাট ভাঙ্গিলে রজনী সময়ে আর কেহ কোথাও নাই, কেবল বহু দূরাগত কতকগুলি বলদে দারুণ অন্ধকার রজনীতে পথ ভ্রমণ সুবিধা জনক নয় বিবেচনা করিয়া গঙ্গাতীরে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ তলায় ছাউনীতে অবস্থান করিতেছে। দরাফ খাঁ সমস্ত দিন অনাহারে বিশেষ পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বলদটীকে বৃক্ষ শাখায়

আবদ্ধ করত চট পাতিয়া তাহাদের সহিত রজনী যাপন জন্য শয়ন করিলেন। এতগুলি টাকা সঙ্গে রহিয়াছে কি জানি অন্ধকার রাত্রে যদি পথে রাহাজানী হয়—মাঠের পথ ত সুগম নহে! দরাফ খাঁ গঙ্গা-তীরে গাছতলায় পড়িয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন, আনন্দবর্দ্ধন পুত্রটীর মুখাবলোকন করিয়া তাহার হৃদয় এখন বেশ আনন্দময়, প্রত্যহ নূতন নূতন আনন্দস্রোত তাহার হৃদয়ে উথলিয়া হৃদয়ে মিলাইয়া যাইতেছে। আজ সমস্ত দিন সেই প্রিয় পুত্রটীকে কোলে করে নাই, তাহার মুখচুম্বন করে নাই, হয়ত খোকা এতক্ষণ, অন্যান্য দিনের মত জাগিয়া দৌরাত্ম্য করিতেছে, মতিয়া হয় ত একলা তাহাকে সামলাইতে পারিতেছে না। আমি বাড়ী না যাওয়ায় সে নিশ্চয়ই জাগিয়া বসিয়া আছে, একে আমার ভাবনা তায় দুরন্ত ছেলের তাড়না, মতিয়া বোধ হয় বিরক্ত হচ্ছে, খোকাকে বোধ হয়—রাগ করিয়া কত বকিতেছে। তাইত রাত কখন পোহাইবে—এখন বোধ হয় রাত্রি অনেক হয়েছে? সংসারী হইয়া দরাফ খাঁর জীবনে এই প্রথম একাকী রাত্রি জাগরণ, মতিয়াকে ছাড়িয়া এই প্রথম তাহার প্রবাস-বাস। ওদিকে মতিয়ারও স্বামীর পদতল ত্যাগ করিয়া, স্বামি-সেবায় বঞ্চিত হইয়া এইরূপ একাকিনী রাত্রি যাপনও জীবনে আর কখন হয় নাই, ইহাতে সতীর অস্থিরতা যে কিরূপ অসহ্য হইয়াছে—তাহা সহজেই বিবেচ্য। খোকা নিকটে ঘুমাইতেছে, যখন তাঁহার অস্থিরতা বেশী অসহ্য হইতেছে, তখন তিনি বিনা দরকারেও পুত্রকে জাগাইয়া তাহার সহিত আপনাপনি কথা কহিতেছেন—বলিতেছেন হাঁরে! খোকা, আজ এত ঘুম কেন; শুন বলি বাবা; তোর জন্য কত ভাল ভাল খাবার আস্‌বে, তুই কটা নিবি বল্‌না। বলিয়া নিদ্রিত শিশুকে নাড়া দিতেছে কিন্তু কে কার

কথা শুনে, শিশু ঘুমে অচেতন। প্রত্যহ রজনীতে খোকা বিছানায় ঘুমাইত, তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে বিনিদ্র-নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ভবিষ্যতের কত সুখের কল্পনা করিত, শিশুর সম্বন্ধে কত আজগুবী গল্প করিয়া তাহাদের সুখের রজনী প্রভাত হইত। আজ গল্প শুনিবার বা শুনাইবার ত একজন নাই, কল্পনার তুলিকায় ভবিষ্যতের মোহন ছবি আঁকিবার চিত্রকরও যে আজ নয়নান্তরালে, কাজেই মতিয়া একাকিনী নিদ্রিত পুত্রকে কোলে করিয়া কক্ষতলে পদচারণা করিতে লাগিল। কিন্তু সতীর স্বামী-অদর্শণ যন্ত্রণা তাহাতেও লাঘব হইল না, একবার পূর্ব্বদিকের বাতায়ন খুলিয়া গগনের প্রতি চাহিয়া দেখিল—তখনও রজনী অনেক, তখনও প্রকৃতিকোলে নীরবতার একটা ভীষণ ভীতি-ব্যঞ্জক "সন্ সন্" শব্দ হইতেছে।

এ দিকে এই, আর ও দিকে রজনীর এই গুরুগম্ভীর যামে ত্রিবেণীর গঙ্গাতীরে অশ্বত্থতলে পড়িয়া দরাফ খাঁও আকাশ-কুসুম কত কি চিন্তা করিয়া প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতেছে। পার্শ্বে অপরাপর যাত্রী সকল গভীর নিদ্রামগ্ন, সমস্বরে নাসিকাধ্বনি সমুত্থিত হইয়া রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে কিন্তু নিদ্রাদেবী দরাফের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিতে-ছেন না, তাঁহাকে কোমল-কোলে স্থান দান করিয়া শান্তি প্রদান করিতে তাঁহার সাহস হইতেছে না। হায়! চিন্তা যার সহচরী, নিদ্রা-সুখ তাহার কোথায়!

এহেন সময়ে দরাফ খাঁ শুনিতে পাইল—অনুনাসিক স্বরে কে কাহাকে বলিতেছে--বাঁবা! আঁমি এঁত বঁড় হঁলুম, আঁমার এঁখনও বেঁ দিলে না"। উত্তর হইল—হ্যাঁ মাঁ! পঁরশু তোঁমার বিঁয়ে হঁবে।

পুনরায় প্রশ্ন হইল--কোঁথায়! কাঁহার সঙ্গে, বঁর ভাঁল ত?

উত্তর—"বঁর খুব ভাল, পঁরশু দিন ঐ যে দরাফ খঁা ঘুমাইতেছে দেখছো, উহার রাখালকে ষাঁড়ে গুঁতাইয়া মারিয়া ফেলিবে, সেইদিন অপঘাত মৃত্যু হইলে তোমার সহিত তাহার বিবাহ হইবে।" কথা দরাফ খাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, তাহার ত নিদ্রা হয় নাই, ভীতচিত্তে, সে এদিক ওদিকে চাহিয়া দেখিল, কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তখন নিশ্চয়ই কোন অপদেবতার ভবিষ্যদ্বাণী বুঝিতে পারিয়া ভয়ে জড় সড় হইয়া একধারে পড়িয়া রহিল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল—হায়! একি শুনিলাম; পরশু রাখালের মৃত্যু হইবে, সে ভূত হইয়া এই প্রেতিনীকে বিবাহ করিবে! আহা! সে যে আমার বড় কাজের লোক, সে মরিয়া গেলে আমার যে অত্যন্ত ক্ষতি হইবে? কিন্তু পূর্ব্ব হইতে ত জানিতে পারা গিয়াছে, এখন দেখি সে কেমন করিয়া মরিয়া ভূত হয়—এই বলিয়া ভীতিবিহ্বল চিত্তে প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।

নানাবিধ চিন্তাজনিত উৎকণ্ঠায় রজনী প্রভাত হইবামাত্রই দরাফ খাঁ অতি দ্রুতবেগে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। তাহার দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান নাই, বলদটীকে তাড়াইয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পথ অতিবাহিত করিতেছে, মাঠের তীব্র কুশাঙ্কুরে তাহার পদতল ক্ষতবিক্ষত হইতেছে—তথাপি ভ্রুক্ষেপ নাই। ত্রিবেণী হইতে প্রায় পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ অতি দ্রুত অতিক্রম করিয়া একপ্রহর পরে দরাফ খাঁ আসিয়া বাটী পৌঁছিল। মতিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়াছে। তথাপি পতিকে দেখিয়া গালভরা সুখের হাসি হাসিয়া বলিল—আচ্ছা! যাহ'ক হাট করা—টাকার জন্য কি জান্ দিবে, দেহ যে একদিনেই আধখানি হয়ে গেছে!

দরাফ খাঁর সে সব কথা ভাল লাগিল না, যে দারুণ সন্দেহ-চিন্তা তাহার প্রাণে অশেষ যাতনা দিতেছে, তাহার তীব্র তাড়নায় অস্থির হইয়া সে বলিল—কেন! গাড়ওয়ানকে দিয়ে ত খবর দিয়াছিলাম, যে আজ রাত্রে বোধ হয় যাইতে পারিব না—সে কি কিছু বলে নাই।

মতিয়া। বল্‌বে না কেন, তবে—সমস্ত রাত,—বলিয়া বিষাদিত চিত্তে সে পুনরায় একগাল হাসিয়া ফেলিল।

প্রণয়িণীর বিষাদ-বিষণ্ণ বদনের প্রতি তখন দরাফের ভ্রুক্ষেপ নাই, সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"রাখাল কোথা গেছে?"

মতিয়া। কেন, সে চাচার সঙ্গে মাঠে গেছে।

দরাফ। না, না, তাকে নানীকে দিয়ে এখনি ডাক্‌তে পাঠাও, বড় দরকার আছে।

মতিয়া স্বামীর কথার আর কোন প্রতিবাদ করিল না, মনে করিল—বোধ হয় কোন দ্রব্যাদি ভুলিয়া আসিয়াছেন। সে নানীকে দিয়া ক্ষেত্র হইতে রাখালকে ডাকিতে পাঠাইল। ইত্যবসরে দরাফ খামারের একটী কক্ষ খালি করিয়া ফেলিল।

মতিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এ কি করিতেছ, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বাটী আসিলে—একটু বিশ্রাম কর, তার পর এসব করো, আর এক্ষণইবা ঘর পরিষ্কারের দরকার কি? যদি একান্ত দরকার হয়ে থাকে ত আমাকেই বলো না, খোকাত এখন ঘুমুচ্ছে!

দরাফ। মতিয়া! পরে বল্‌বো—এ সকল তুমি পারবে না, খুব তাড়াতাড়ি কর্ত্তে হবে।

মতিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না, হতভম্ব হইয়া দাড়াইয়া রহিল। কর্ত্তা গৃহে আসিয়াছেন এবং তাহাকে ডাকিতেছেন, দাসীর মুখে শুনিয়া রাখাল ক্ষেত্র হইতে গৃহে আসিল এবং কর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইল।

দরাফ রাখালকে দেখিয়া সাগ্রহে বলিল—দেখো রাখাল! এ তিন দিন তোমাকে কোন কাজ করিতে হইবে না, তুমি এই তিন দিন ঘরের মধ্যে বসিয়া থাক, কোথাও যাইতে পারিবে না, তোমার যা যা দরকার হইবে, আমি স্বয়ং যোগাইব, এ কয় দিন আমিই তোমার হুকুমের চাকর হয়ে থাক্‌বো। আমি কাল রাত্রে তোমার বিষয়ে একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছি—বলে এত কচ্ছি,আর এই তিনটে দিন বইত নয়!" বলিয়া রাখালকে সেই গৃহে আবদ্ধ রাখিল, ঘরের মধ্যেই তাহার

আহারাদি হইতে লাগিল। আহাদির খুব আড়ম্বর এবং যে শয্যায় সে কখন শয়ন করে নাই, অদ্য তাহাই প্রস্তুত হইল, আহা! একটা লোক যখন চিরদিনের জন্য চলে যাবে, তখন সে একটু ভোগ করুক। আর পূর্ব্ব হইতে যখন জানা গিয়াছে, তখন যতদূর সম্ভব ইহার জীবন রক্ষার চেষ্টা করা যাইবে। এই মনে করিয়া দরাফ খাঁ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করত রাখালের প্রহরী এবং পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত হইল। পত্নীকে এবং সওদাগরকে নিভৃতে সকল কথা বলিল, শুনিয়া তাহারাও অত্যন্ত দুঃখিত হইল এবং যাহাতে বেচারার প্রাণ রক্ষা হয়—বিধিমতে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল।

//ছোট লোককে বড় বেশী ভাল বাসিলে বা খাতির করিলে তাহার সন্দেহ অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। গালাগালি খাওয়া যাহার নিত্য অভ্যাস, মাঠের রোদে-জলে যে চিরজীবন কাটাইয়াছে, সামান্য ছেঁড়া চেটা যাহার শয্যা, তাহাকে আজ বাপু বাছা করিয়া আদর আপ্যায়নে তুষ্ট করত সুকোমল শয্যায় শয়ন করিতে দিলে সে দারুণ সন্দেহ করিবে না বা ভীষণ বিব্রত হইয়া পড়িবে না ত কি?

রাখাল মনে করিল—নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোন খারাপ মতলব আছে, নতুবা এ আবার কি, ঘরের ভিতর পুরিয়া আটক রাখা কেন, আর এত বাঁধা-বাঁধিই বা কেন? নিশ্চয়ই আমার কোন দোষ ধরা পড়েছে, তাই আমাকে প্রাণে মারবার জন্য এরূপ ষড়যন্ত্র করছে। রাখাল কর্ত্তার মুখের উপর কোন কথা বলিতে পারিল না কিন্তু মন তাহার সন্দেহপূর্ণ হইয়া উঠিল। দরাফ ঘরের মধ্যে যুবককে আবদ্ধ রাখিয়া দ্বারদেশে উপবেশন করিয়া রহিল। দৈবাৎ যদি কোথাও যাইতে হয়, গৃহে তালা বন্ধ করিয়া যায়, আবার তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া

আসিয়া দ্বারদেশে উপবেশ করে। ব্যাপার দেখিয়া রাখাল ঘোর সন্দেহে আকুল হইয়া উঠিল। তাহাকে যে প্রাণে মারা হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি, নতুবা এতদিন না ততদিন আজ এত কড়াকড়ি কেন ? ছোট লোক ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত আদর যত্নের মধ্যে নিজের প্রাণনাশের ভাবনা ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িল। প্রথম দিন এক প্রকার কষ্টে কাটিল। বনের পাখী পিঞ্জরাবদ্ধ হইলে যেমন ছট্‌ফট্‌ করে ; স্বাধীন-প্রাণ রাখালও তেমনি প্রাণ ভয়ে ভীত, গৃহের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া ধড়ফড় করিতে লাগিল। দরাফ দ্বারদেশে বসিয়া তাহাকে কত বুঝাতে লাগিল, কত সাহস দিতে লাগিল, তার কিছু ভয় নাই, এই আজকের দিন, আর কালকের দিনটা, থাক বাপু একটু চুপ করে, তার পর যেমন ছিলে তেমনি থাক্‌বে। কিন্তু ছোটলোকের প্রাণ সে আশ্বাস বাক্যে আশ্বস্ত হইল না। সে গৃহের প্রত্যেক দ্রব্যে যেন মৃত্যুর সজাগ চিত্র দেখিতে লাগিল, একদিনের চিন্তায় তেমন যে সবলকায় দেহ অর্দ্ধেক কমিয়া গেল। দ্বিতীয় দিনের অস্থিরতা আরও বেশী, দরাফ খাঁ বুঝিতে পারিল কিন্তু ছাড়িয়া দিতে ত তাহার প্রাণ চায় না, সে যে স্বকর্ণে সে ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়াছে ; তবে কেমন করিয়া সে হেলায় একজনকে মৃত্যুর মুখে ডালি দিবে, তাহাকে ভূত হইতে দিবে, না দেখি আর একদিন রাখিয়া যদি বাঁচাইতে পারি। দরাফ বলিল—দেখ, রাখাল ! আজ ত গেলো আর কালকের দিন, তাহা হইলেই তোকে ছাড়িয়া দিব। ক্রমে সমস্ত দিন এক প্রকারে কাটিয়া গেল, রজনী যোগে তাহাকে চোব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি খাদ্য সকল প্রদান করা হইল। কিন্তু রাত্রে সে আর কিছুমাত্র আহার করিতে পারিল না, এমন যে রাজভোগ, হতভাগ্য যাহা জীবনেও কখন

দেখে নাই, তাহার তিলমাত্র সে গলাধঃকরণ করিতে পারিল না, ভয়ে জড়সড় হইয়া প্রাণহীনের ন্যায় শয্যাতলে নির্ব্বাক-নিস্পন্দভাবে পড়িয়া রহিল। দরাফ খাঁ কত বুঝাইল কিন্তু সে কোন কথা কহিল না। সে দিন রাত্রেও দরাফ খাঁ সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া রাখালের গৃহ-দ্বারে প্রহরীর কার্য্য করিতে লাগিল।

বহুকষ্টে দুঃখের রজনী আবার প্রভাত হইল। আজ তৃতীয় দিন, কোন প্রকারে আজকের দিনটা একবার কাটাইতে পারিলেই ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হইয়া যায়, দরাফ খাঁ আজ আর কোথাও না যাইয়া দরজা আবদ্ধ করত দ্বারদেশে স্থিরভাবে বসিয়া রহিল। আর রাখাল, সে তাহার প্রাণ লইয়া যে বিশেষ বিব্রত হইয়াছে; জীবনের আশা, আত্মরক্ষা করা, পাষণ্ড মনিবের হস্ত হইতে আজ কোন প্রকারে উদ্ধার হইতে না পারিলে রজনীর অন্ধকারে আর তাহার স্কন্ধে মস্তক থাকিবে না—এই স্থির নিশ্চয় করিয়া সে পলাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। সেকালে সকলের গৃহই মৃত্তিকা নির্ম্মিত এবং বিচালির দ্বারা আচ্ছাদিত হইত। বড় বড় ধনীর গৃহও এইরূপ ভাবে নির্ম্মিত হইত, এখনকার মত ইষ্টক নির্ম্মিত অট্টালিকার প্রচলন আমাদের দেশে ছিল না। দরাফ খাঁ রাখালকে যে গৃহে আবদ্ধ রাখিয়াছিল, সেই গৃহটিও এই প্রকারের, রাখাল দেখিল আর এমন করিয়া ভাবিলে হইবে না, পলাইবার উপায় করি, এই বলিয়া সে মেটে ঘরের আড়কাট্টায় উঠিল এবং পরলের ভিতর দিয়া গৃহের বাহিরে লাফাইয়া পড়িয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিল। গৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহার বাঁচিবার আশা যায় পর নাই বলবতী হইয়াছে, এখন কেহ সন্ধান না পাইলে বাঁচিতে পারি, এই বিবেচনা করিয়া সে প্রাণপণে দৌড়াইতে লাগিল। পাড়ার কেহ

এ সকল কথা ঘুণাক্ষরেও জানে না, রাখালকে দৌড়াইতে দেখিয়া মনে করিল,—সে বোধ হয় বিশেষ কোন কাজে যাইতেছে, তজ্জন্য কেহ কোন কথা বলিল না—বা বাধা দিল না।

রাখাল যখন দৌড়াইয়া আক্লান্তভাবে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে একটী মাঠের প্রান্তভাগে আসিয়া পড়িয়াছে। তখন অদূরে দুইটী ভীষণাকার ষণ্ড পরস্পর কলহ করিয়া সেই দিকে দৌড়িয়া আসিতেছিল; রাখালের তখন আর অন্য দিকে যাইবার ক্ষমতা নাই, বন্ধুর পথের ধারে সে সেই প্রচণ্ড ষণ্ডদ্বয়ের মধ্যে পড়িল, কিছুদূরে দুই একজন লোক ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতেছিল, রাখালকে বাঁচাইবার জন্য তাহারা দৌড়িয়া আসিল কিন্তু পারিল না, তাহার পূর্ব্বেই ষণ্ডদ্বয় শৃঙ্গাঘাতে তাহাকে যমলোকে প্রেরণ করিয়াছে। সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল; বায়ুবেগে এই ভীষণ বার্ত্তা চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। দরাফের কর্ণে একথা পঁহুছিতে বাকী রহিল না। সে দরজা খুলিয়া দেখিল—রাখাল গৃহে নাই, ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিল—সত্য সত্যই রাখাল মারা গিয়াছে, নিয়তির গতিরোধ করা, মানবের অসাধ্য তখন সে বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখালের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গৃহে আসিল এবং তৎক্ষণাৎ আহারাদি করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে ভূতের বিবাহ দেখিতে ত্রিবেণীর তীরে সেই অশ্বত্থ তলায় আসিয়া সেইরূপে পড়িয়া রহিল। মতিয়া আসিবার সময় কত নিবারণ করিল কিন্তু কৌতুহলাক্রান্ত দরাফ খাঁর কর্ণে সে কথা স্থান পাইল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দৈবমহিমা মুগ্ধ।

তুমি যে জাতিই হওনা—ভারত মাতার পবিত্র গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার সুকোমল ক্রোড়ে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইলে ধর্ম্মকর্ম্মে তোমার মতিস্থির হইবেই হইবে, প্রবৃত্তি তোমার ধর্ম্মভাবে গঠিত হইয়া দেহমন পবিত্র করিবেই করিবে। এদেশের অনু-পরমানু ধর্ম্মালোক প্রদীপ্ত বলিয়া এ দেশজাত মনুষ্য মাত্রেই ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত, শুধু হিন্দু কেন, এদেশের মুসলমানগণও যে কোন অংশে ধর্ম্ম-কর্ম্মে নিকৃষ্ট—ধর্ম্মভাব যে কোন অংশে তাহাদের মধ্যে হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। হিন্দু-দের সহিত আচার-ব্যবহারে কতকটা পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও ধর্ম্ম-কর্ম্মে তাঁহারা যে হিন্দুর মত মায়ের মুখোজ্জ্বল করিতে পারিয়াছেন—তাহা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। প্রতিনিয়ত মুসলমান-গণও ধর্ম্ম-কর্ম্মের পবিত্র অনুষ্ঠান করিয়া আপনাদের পবিত্রতা বিধান করিয়া থাকেন; অতি হীনাবস্থার লোক হইতে পৃথিবীপতি সম্রাট পর্য্যন্তও দিবসে পাঁচবার নমাজ পাঠ করিয়া ভগবদুদ্দেশ্যে আপনার ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল প্রার্থনা করেন; হে খোদাবন্দ করিম! হে আল্লা হো আক্‌বর! তুমি আমাদের জীবনের পথ পরিষ্কার করিয়া দাও; আমারা যেন তোমাতে মজিয়া, তোমার পাদপদ্ম ভজিয়া এজীবন ধন্য করিতে পারি। মুসলমানগণের মধ্যে ধর্ম্মের উজ্জ্বলভাব যে বিশেষ

ভাবে সুদৃঢ়—তাঁহাদের নমাজ পাঠের নিয়ম প্রণালী দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। এখনই যখন মুসলমানগণ ধর্ম্মে এত অনুরক্ত, এত অনুপ্রাণিত, তিনশত বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের রাজত্ব সময়ে যে ধর্ম্মভাব আরও প্রবল ছিল, তাহা বেশ অনুমান করিতে পারা যায়।

দরাফ খাঁ গৃহ হইতে বাহির হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে ত্রিবেণীর ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল। অশ্বত্থবৃক্ষতলে আপন আস্তানা স্থাপন করিয়া সন্ধ্যাকালীন নমাজ পাঠ করিলেন। আজ নমাজে দরাফের চিত্ত একান্ত তদ্গত হইয়াছে—আজ আর কোন প্রকার চাঞ্চল্য আসিয়া তাহার চিত্তকে অস্থির করিতে পারিতেছে না। এতদিন উদ্ধত-প্রকৃতি দরাফ মনে করিত—মানুষের ক্ষমতার তুল্য ক্ষমতা আর কাহারও নাই; মানুষ যাহা মনে করে, চেষ্টা করিলে তাহাই সম্পাদন করিতে পারে, নিয়তির গতিরোধ করা তাহাদের অসাধ্য নয়—যৌবনের ঔদ্ধত্য বশতঃ তাই সে রাখালের জীবন রক্ষার্থে প্রাণপণ করিয়া এক্ষণে বিফল মনোরথ হইলে মনে করিল—না, মনুষ্য শক্তির উপরেও একজন অসীম শক্তিধরের শক্তি প্রতি নিয়ত বর্ত্তমান থাকিয়া বিশ্বকার্য্যের বৈচিত্র্য বিধান করিতেছে;—জগৎ প্রবাহ যে একই রকমে প্রবাহিত হইবে না—একই প্রকারে চিরদিন থাকিবে না, সেই পরম শক্তিধর অলক্ষিতে থাকিয়া তাহারই পরিবর্ত্তন বিধান করিতেছেন, মনুষ্যশক্তি তাহার নিকট অতিতুচ্ছ—নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মনুষ্য শক্তিত পরাভব প্রাপ্ত হয় কিন্তু সে অপার্থিব শক্তি অপ্রতিহত—তাহার পরাভব অসম্ভব, তবে কোরাণ বলেন—যদি তুমি তাঁহাকে আপনার প্রাণ দিয়া বশীভূত করিতে পার, যদি তাঁহার জন্য তোমার প্রাণ উৎসর্গ করিতে সক্ষম হও,

তাহা হইলে তাঁহার শক্তিতে শক্তিমন্ত হইয়া একদিন না একদিন তাঁহার পদতলে স্থানপ্রাপ্ত হইয়া জগতে তুমি অঘটন ঘটাইতে পারিবে। প্রাণময়ে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া শক্তি সঞ্চয় কর, দেখিবে—জগতে তোমার অসাধ্য কিছুই থাকিবে না। হিন্দুধর্ম্মেরও ইহা সার উপদেশ; তোমার হৃদয় রাজ্যে সে ধন সদা বিরাজিত, তোমার ভক্তিমূলে বিক্রীত হইবার জন্য সে শক্তিধর সদাই লালায়িত, ভক্তিমূলে ভক্তের কেনা হওয়াই তাঁহার একান্ত সাধ, তাই তিনি তোমার কাছ ছাড়া না হইয়া তোমারই মধ্যে বিশেষ ভাবে জড়িত হইয়া তোমাকে শক্তিধর করিবার জন্য সদাই সমুৎসুক—কিন্তু কই, তুমি ত তাঁহার আহ্বান শুনিতে পাও না—নানা প্রকার বাহ্যিক কোলাহলে যে তোমার কর্ণ বধির হইয়াছে, সে প্রাণের ডাক, শক্তিময়ীর সে স্নেহ আবাহন যাহা অবিরত তোমার হৃদয়ে স্পন্দিত হইতেছে—তাহা যে তুমি শুনিতে পাওনা—বা তাহা শুনিবার অবসর যে তোমার হয় না, বৃথা শ্রবণ সুখকর সুখান্বেষণে তুমি সদা ব্যস্ত রহিয়াছ, সে মধুর ডাক তোমার শ্রবণ বিবরে পঁহুছিবে কোথা হইতে ভাই! বাহিরের এই সকল শ্রবণকঠোর শব্দ পরিত্যাগ করিয়া একবার ভিতরে প্রবেশ কর দেখি। সেই শান্ত-সলিলা, সুনির্ম্মলা, ত্রিবেণীর পবিত্র সলিলে অবগাহন করিয়া সজাগ কুণ্ডলিনীর সহায়ে তোমার প্রাণটীকে একবার সেই প্রাণের প্রাণ প্রাণময়ের প্রাণে মিশাইয়া দাও দেখি; তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, তোমার প্রাণের তেজ কত, তাহা হইলে দেখিবে তুমি প্রাণ বিশ্বের-প্রাণ শক্তিতে কিরূপ অটল, অচল, প্রতিহত গতিতে কার্য্য করিতেছ। ভাই সাধক! জেনো, প্রাণ না দিলে প্রাণ পাওয়া যায় না, প্রাণের যথার্থ উদ্বোধন শক্তি জাগে না।

দরাফ খাঁ আজ তাই ত্রিবেণীর ঘাটে নমাজে তন্ময় হইয়া গিয়াছে, তাহার বাহ্য চৈতন্য নাই; সে উদ্ধত প্রকৃতি যেন জড়ভাবে আজ ত্রিবেণী তীরে অশ্বত্থবৃক্ষ তলে স্থির হইয়া গিয়াছে। সমস্ত দিন আহার নাই, তাহার জন্য যে একটা ক্ষুধা-তৃষ্ণা আজ দরাফকে বিব্রত করিতে পারিতেছে না। সেই একটা বিষয়ের চিন্তা, হায়! এত চেষ্টা, এত বাঁধা বাঁধি করিয়া আমি রাখালকে রাখিতে পারিলাম না। আমার শক্তি, আমার চেষ্টা যাহাকে আমি সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতাম, আজ কাহার শক্তিতে তাহা ব্যর্থ হইল? দয়াময় খোদা! বুঝাইয়া দাও, একি তোমারই শক্তি, যাহা জগতে অদ্বিতীয়, আর কেহ তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না!

দরাফ নিজকে অত্যন্ত বড় মনে করিত, তাই সে কাহার কথা শুনিত না—কাহার বারণ মানিত না—যখন যাহা মনে উদয় হইত ভাল হউক, মন্দ হউক—তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিয়া ফেলিত। আজ তাহার সে আত্মম্ভরিতা ঘুরিয়া গিয়াছে—কোথা হইতে একটী অজানিত মহাশক্তি দ্বারা পরাজিত হইয়া সে আত্মাভিমান, সে অহঙ্কার চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে—হায়! আমার এত চেষ্টা, এত কৌশল সমস্ত বিফল হইল! দরাফের প্রাণ আজ উদাসভাবাপন্ন—তাই সে সায়াহ্নে নমাজে ভাববিভোর হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অহং-প্রতিষ্ঠ, আত্মশক্তি সমন্বিত মানুষই কালে জগতে বড় হইতে পারে—ইহাই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব লাভের পরম লক্ষণ!

সেদিনের মত না হউক—আজও অশ্বত্থ বৃক্ষতলে কয়েক জন স্নানার্থী ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছে, হাটের ছাউনীতলে তাহারাও অবস্থান করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কয়েকজন মুসলমানও ছিল—বহুক্ষণ

হইল তাহাদের নমাজ পাঠ শেষ হইয়াগিয়াছে কিন্তু দরাফের এত বিলম্ব কেন? তাহারা ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিল না। বহুক্ষণ পরে দরাফ প্রকৃতিস্থ হইয়া "আল্লা হো আকবর" শব্দে ত্রিবেণী তীর প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। তারপর সামান্য জলযোগ করিয়া ছাউনীতলে সামান্য শয্যোপরি শয়ন করিয়া তাহার ঈপ্সিত বিষয়, সেই ভূত ও প্রেতিনীর বিবাহ-বিষয় শ্রবণে উৎকর্ণ হইয়া কপট নিদ্রাগত হইল।

দারুণ অন্ধকার রজনীর গভীর যামে যখন প্রকৃতির কোলে জীবকুল দুশ্চিন্তাহারিণী নিদ্রাঘোরে বিচেতন—ঝিল্লিরবও যখন নীরব হইয়া ধরামাঝে বিষম নীরবতার সৃষ্টি করিয়াছে; ভূগর্ভ হইতে ভীতিপ্রদ কেমন একটা ভীমভাব রজনীর ভীষণতা চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিয়াছে; ঠিক সেই সময় আবার—আবার সেই অনুনাসিক শব্দ প্রকৃতির মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া যেন উত্থিত হইতে লাগিল। যদিও তিন চারিদিন রাত্রি জাগরণে দরাফের চক্ষু নিদ্রাতুর হইয়া পড়িয়াছিল, যদিও জাগিয়া থাকা তাহার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব—তথাপি দরাফ বিনিদ্র অবস্থায় শুনিতে পাইল—বাঁবা। কঁই আঁজ আঁমার বিবাঁহ হইল না?

"নাঁ মাঁ! বিবাঁহে এঁকটু গোঁল হইয়াছে—রাঁখাল মরিয়াছে সঁত্য—ঘাঁড়েও তাঁহাকে গুঁতাইয়াছে কিন্তু সেঁ ভূঁত হঁয় নাই।"

"কেঁন,' অপঁঘাতে মঁরিল ত?"

"হাঁ, তাঁ বটে কিন্তু ষাড় দুইটা গঁঙ্গাতীর হইতে মারামারি করিয়া আঁসিতেছিল?"

"তাঁহাতে কি হইল?"

"তাঁহাদের শৃঙ্গে তিল মাত্র গঙ্গা মৃত্তিকা লাগিয়াছিল, বলিয়া ঐ মৃত্তিকা স্পর্শে সে আর ভূত হইল না—উদ্ধার হইয়া গিয়াছে?"

"বটে, তবে উপায়?"

"উপায় শীঘ্রই হইবে—তাঁহার জন্য আর চিন্তা কি মা?" বলিয়া উভয়ে নীরব হইল—তারপর উপদেবতাগণের আর কোন কথা শুনিতে পাওয়া গেল না।

দরাফ খাঁ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শ্রবণ করিয়া বিস্ময় সাগরে ডুবিয়া গেল, মনে মনে বলিল—কি আশ্চর্য্য; হিন্দুর গঙ্গা দেবীর এতদুর মহিমা! গোশৃঙ্গে তিল পরিমাণ মৃত্তিকা লাগিয়া ছিল বলিয়া তাহার স্পর্শে রাখালের অপঘাতে মৃত্যু হইয়াও পরমগতি লাভ হইল, —ভূত না হইয়া সে উদ্ধার হইয়া গেল! মরি মরি দেবীর এত মাহাত্ম্য! তবে আর কেন, আমি আর গৃহে যাইব না—এই গঙ্গাতীরে বসিয়াই দেবীর আরাধনায় জীবনপাত করিব, তাহা হইলে ত নিশ্চয়ই আমার ন্যায় পাষণ্ডের নিস্তার হইবে? এই বলিয়া উদাস প্রাণে দরাফ খাঁ গঙ্গার সলিল সমীপে উপনীত হইল—এবং পবিত্র বারি স্পর্শ করিয়া বলিল—দেবি! আমি অতিনিচ, অতি ঘৃণিত জীব, আজীবন কোন সৎকার্য্য করি নাই; কেবল উদ্দাম প্রকৃতির বশে মত্ত হইয়া কত অন্যায় কর্ম্ম করিতেছি, আহার-বিহারে, আমোদ-আহ্লাদে বিভোর হইয়া এ জীবন বৃথায় নষ্ট করিয়েছি—ইহাওত একপ্রকার অপঘাত হইতেছে—তাই দেবি! আজ তোমায় স্পর্শ করিয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম—আমাকে উদ্ধার কর।

দরাফ খাঁর মতিগতির ঘোর পরিবর্ত্তন হইল। জগতের সমস্ত সুখ-

সাচ্ছন্দ্য, সমস্ত ভোগ-বিলাস, আনন্দ-অভিলাষ তাহার নিকট অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কি যেন একটা অপার্থিব শক্তি, একটা অমানুষিক জ্ঞান তাহার হৃদয়ে হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া তাহাকে প্রবুদ্ধ করিয়া দিয়া বলিতে লাগিল :—"এ নশ্বর জগতের কিছুই কিছু নহে; কিছুতেই মানুষকে মনুষ্যত্ব দিতে পারে না; এক ধর্ম্মের সহায়ে ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করা ভিন্ন মানুষ হওয়া যায় না; মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্যই কেবলমাত্র তাঁহার দর্শন লাভ, খোদার দর্শনলাভ করিয়া তাঁহার সহিত মিশিয়া এক হইয়া যাইতে পারিলেই তোমার মানব জন্ম সার্থক্য, নতুবা বৃথা যাতায়াত, বৃথা ইহার সুখদুঃখ ভোগ—ইহার জন্য পশু ও মানুষে প্রভেদ কোথায়? যদি দেবতার দর্শন লাভ করিয়া তাহার পদে আত্মসমর্পণ করিতে না পারলে, ত তোমার অন্য জীব হইতে মহত্ব কোথায় রহিল? দরাফ খাঁর মনে আবার অন্যরূপ চিন্তার উদয় হইল। হায়! সে যে যবনজাতি—মুসলমানের প্রতি কি হিন্দুর দেবতা কখন কৃপা করিতে পারেন? ঘোর সন্দেহে দরাফের হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল; প্রাণ হতাশ-অবসাদে ডুবিয়া গেল—মন নিরানন্দে দিশাহারা হইয়া পড়িল—হায়! তবে কি দেবতার নিকটও জাতি ভেদ আছে? তাঁহার নিকটও কি হিন্দু মুসলমানের পৃথক আসন, তবে কি আমার উদ্ধারের উপায় নাই! সেই ঘোর তমসাচ্ছন্ন নিভৃত নিবীড় নিশীথে একাকী পুণ্যতোয়া পতিত পাবনী জাহ্নবী তীরে বসিয়া দরাফ গভীর চিন্তামগ্ন। ভয়ে নহে, ক্ষোভে-দুঃখে হৃদয় দুর দুর কাঁপিতেছে; নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারে অশ্রু পতিত হইয়া বুক ভাসিয়া যাইতেছে;—পরকাল নিস্তার জন্য অস্থির হইয়া দরাফ কাঁদিতেছে, আর গঙ্গাবারি

স্পর্শ করিয়া ঐকান্তিক প্রাণে বলিতেছে—"হায়! তবে কি আমার উদ্ধার হইবে না; হিন্দুর দেবতার নিকটে কি মুসলমানের কৃপা লাভের আশা নাই? হায়! সেখানেও কি দুরন্ত জাতি ভেদ, পরস্পর পৃথক করিয়া দিতেছে—মিশিবার আশা কি নাই! সেই নীরব নিস্তব্ধ প্রকৃতির কোলে কাহার সাড়া শব্দ নাই—দুরন্ত অন্ধকারময়ী রজনীর শেষ সময়ে শ্মশান সন্নিকটবর্ত্তী অশ্বত্থবৃক্ষের সেই ভীষণ বিভীষিকা; বীচি-বিক্ষোভিত পতিত-পাবনী জাহ্নবীর সেই তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া এ সময় এখানে কেহ একাকী অবস্থান করিতে পারে না; ছাউনী ছাড়িয়া আসিয়া শ্মশানের ধারে অশ্বত্থ তলে নদীর ঘাটে আসিয়া উপবেশন করাও সামান্য সাহসিকতার কায নহে; কিন্তু দরাফ হৃদয় বেগে,—দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া; মৃত্যু ভয়-বিচলিত না হইয়া দেবীর সলিল স্পর্শ করিয়া নির্ভয়ে প্রাণের আবেগে কেবল বলিতেছে—"তবে কি আমার কোন উপায় নাই?"

এমন সময় সেই গভীরা রজনীর দুর্ভেদ্য নীরব আবারণ ভেদ করিয়া গুরু গম্ভীর স্বরে কে বলিল—"নিশ্চয়ই আছে, বৎস। নিশ্চয়ই আছে; দেবতার নিকট আবার জাতি ভেদ কি?" সেই বিরাট অন্ধকারের কোলে, প্রকৃতির সেই বিভীষণ ভীষণতার মধ্যে হঠাৎ সুমধুর কণ্ঠে মনুষ্যের আশ্বাস-বাণী শুনিয়া দরাফ মন্ত্র-মুগ্ধ-বৎ বিস্ময়-বিস্ফারিত-নয়নে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল—এক জটাজুট-ধারী. জ্যোতির্ম্ময় সন্ন্যাসী মূর্ত্তি দণ্ডায়মান—সেই দারুণ অন্ধ-কারের মধ্যেও তাঁহার দিব্যজ্যোতি যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে;—দরাফ বাকনিষ্পত্তি করিতে পারিল না; নীরবে করযোড়ে পদপ্রান্তে নত হইয়া পড়িল। সন্ন্যাসী শরণাগতকে অভয় দিয়া মৃত্তিকা হইতে

উত্তোলন করিলেন। তাঁহার ঝুলির মধ্যে অগ্নি ও বর্ত্তিকা ছিল, তদ্দ্বারা আলোক প্রজ্জ্বালিত করিলেন। বহুক্ষণ অন্ধকার ভোগ করিয়া আলোক সাহায্যে দরাফ সন্ন্যাসীর আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল, এমূর্ত্তি যেন তাহার বহু পূর্ব্ব পরিচিত; বহু পরিবর্ত্তন হইলেও যেন একটা পূর্ব্বস্মৃতি তাহার সহিত মাখা-মাখি ভাবে জড়িত রহিয়াছে। এ সৌম্যমূর্ত্তি যে সে পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছিল, এখন ঠিক তাহা স্মরণ করিতে পারিতেছে না। দরাফ অবাক হইয়া সন্ন্যাসীর ক্রিয়া কলাপ, তাহার অঙ্গ-জ্যোতি দেখিতে লাগিল। সন্ন্যাসী সাগ্নিক ব্রাহ্মণ; এই জন্ত অগ্নি তাঁহার নিকটেই ছিল; ব্রাহ্মণ বলিলেন—বৎস! চিন্তা নাই; দেবতার নিকট জাতি ভেদ নাই; তুমি যে জাতিই হও না কেন, কাতর প্রাণে ডাকিলেই তাঁহার আসন টলে; আর তুমি নিজেকে যে জাতি মনে কর; তুমি সে জাতি নহ; অপেক্ষা কর, আমি স্নান করিয়া আসিয়া তোমাকে সমস্ত বলিতেছি। এই বলিয়া সন্ন্যাসী "শ্যামা ব্রহ্মময়ী মা, পতিত পাবনী,—নিস্তার কর। তৎপর "বিষ্ণুপাদার্ঘ্য সম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনী, ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি! পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বপাপহরো হরিঃ।" সন্ন্যাসী উক্ত প্রকার স্তব পাঠ করিতে করিতে পূত সলিলে অবগাহন করিলেন। দরাফ বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে, পলকবিহীন নেত্রে চাহিয়া সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব তেজোময় মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল এবং আপনার সৌভাগ্য পরিবর্ত্তনের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে হৃদয়কে আশ্বাসবদ্ধ করিয়া তুলিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসীর কৃপা।

তখনও রাত্রির এক যাম অবশিষ্ট আছে। সন্ন্যাসী স্নান সমাপন করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করত সাগ্নিক ব্রাহ্মণের ব্রতানুসারে অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিক-হোম সমাপন করিলেন। সমস্ত দিবস পথ অতিবাহিত করায় আহারাদি কিছুই হয় নাই। ঝুলি হইতে ফলমূলাদি বাহির করিয়া যুবককে কিছু প্রদান করিলেন, নিজে ও যৎ সামান্য কিছু আহার করিলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর সন্ন্যাসী বলিলেন—"দরিয়ার! তোমার পূর্ব্বের কথা কিছু মনে পড়ে কি? ষোড়শী এখন কেমন আছে; সে কতবড়টী হইয়াছে?" দরাফ খাঁ চমকিত হইল—বাল্যের সেই নাম আমার স্ত্রীর সেই বাল্যকালের নাম, সন্ন্যাসী কেমন করিয়া জানিলেন—তবে কি বাস্তবিক আমার সন্দেহ সত্য, ইনি কি আমার পরিচিত ব্যক্তি? প্রকাশ্যে বলিলেন—আজ্ঞে, হাঁ খুব সামান্য মনে পড়ে।

সন্ন্যাসী—তুমি প্রথমে যে কালী বাড়ীতে মেহের আলীর দ্বারা আশ্রয় পেয়ে ছিলে, সেই ব্রহ্মচারিণী ভুবনেশ্বরীর কথা মনে পড়ে কি? ভুবনেশ্বরীর কথা শুনিয়াই দরাফের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল, পূর্ব্বস্মৃতি সমুদয় জাগিয়া উঠিল; তখন বুঝিতে পারিয়া দরাফ বলিল—আপনি কি সেই ঠাকুর রামানন্দ?

সন্ন্যাসী বলিলেন—হাঁ বৎস, আমি সেই দেবী ভুবনেশ্বরীর

প্রতিপালিত, কালিকার পূজক রামানন্দ, নাজেমের অত্যাচারে এস্থান পরিত্যাগ করিয়া একণে সুদূর অমৃতসহরে সেই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় সস্ত্রীক কাল যাপন করিতেছি। তোমার জীবন বৃত্তান্ত আমি বিশেষ করিয়া জানিয়া তোমার সহিত দেখা করিবার জন্য আসিয়াছি।

দরাফ বলিল—ঠাকুর সে পাষণ্ড নাজেম আর ইহ সংসারে নাই। কয়েক দিন মাত্র অতিশয় দুর্দ্দান্ত হইয়া, আমাদের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য প্রাণপণ করিয়া অবশেষে আপনিই নিতান্ত অনাথের ন্যায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছে। তাহার স্থাপিত মোল্লাপাড়ায় এখন কতকগুলি অধার্ম্মিক পাষণ্ড মাত্র জীবিত আছে, কিন্তু বিষদন্ত-বিহীন সর্পের ন্যায় হীন বীর্য্য।

সন্ন্যাসী। হাঁ বৎস! আমি সমস্তই জানি, যখন রাজা রণবীর তোমার পক্ষ অবলম্বন করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করেন; যখন বশিষ্ঠ গঙ্গার মাহাত্ম্য নষ্ট করিতে দুর্দ্দান্ত ফকীরের জীবনান্ত হয়, সে সময় আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম; তোমার প্রতি রাজার করুণার কথা সমস্তই জানি; রাজা আমার শিষ্য, তখন পাষণ্ড নাজেমের জন্যই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই।

দরাফ। ঠাকুর! একণে পূজনীয় সওদাগর আমাদের পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া উভয়কে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন। এখন ষোড়শী—মতিয়া হইয়াছে, দরিয়ার পরিবর্ত্তে এখন আমাকে সকলে দরাফ খাঁ বলিয়া ডাকে, আজ কিছু দিন হইল—আপনার আশীর্ব্বাদে একটী পুত্ররত্ন লাভ হইয়াছে।

সন্ন্যাসী সন্তোষ সহকারে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—বৎস!

ভগবানের কৃপায় তোমরা পুত্রটীর সহিত দীর্ঘ জীবন লাভ কর, বাল্যে অতিরিক্ত কষ্ট পাইয়াছ বলিয়াই ভগবানের দয়া তোমাদের উপর এত অধিক; আমি আজ কয়েকদিন আশ্রম হইতে বাহির হইয়া রাজার সহিত ও তোমার সহিত দেখা করিব বলিয়া হুগলী অভিমুখে রওনা হইয়াছি, আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই রাজবাটীতে উপস্থিত হইবার কথা কিন্তু পথে কোন শিষ্যের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় বিলম্ব হইয়াছে; সমস্ত দিন পূজাহ্নিক হয় নাই; তাই মনে করিলাম—পবিত্র ত্রিবেণী তীর্থে স্নান করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতঃ প্রাতে তোমাদের সহিত দেখা করিব, কিন্তু হঠাৎ এই স্থানে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া এবং তোমার মানসিক অবস্থা দেখিয়া আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। ইহার কারণ কি বৎস! কেন তুমি এই গভীর রজনীতে স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ভাগিরথী সলিল স্পর্শে এরূপ অক্ষেপোক্তি করিতেছিলে—কি হইয়াছে; জীবনে কি কোন নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে?

দরাফ খাঁ অকস্মাৎ তাহার মনে ভাবান্তর হইবার কারণ সকল রামানন্দ সমীপে আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল এবং বলিল—ঠাকুর! হিন্দু দেবতার কৃপা কি মুসলমানের উপর বর্ষিত হয় না, আমি কি গঙ্গাদেবীর দর্শন লাভ জীবন ধন্য করিতে পারিব না?

রামানন্দ যুবকের মানসিক পরিবর্ত্তনের কারণ শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইলেন; দরাফ খাঁ যে জন্মোচিত আকরে আকর্ষিত হইয়াছে; সে যে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কেবল ঘটনাচক্রে মুসলমান হইয়াছে; তাহার সে বিষয়ে বিশেষ বোধ গম্য হইল; ভুবনেশ্বরীর অনুমান এতদিনে সত্য হওয়ায় তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল

না। তিনি স্পর্দ্ধা করিয়া তদীয় শিষ্যা কমলাদেবীকে বলিয়া আসিয়াছেন—তোমার পুত্র বাণে ভাসিয়া গিয়াছিল বটে কিন্তু সে মরে নাই; আমি তাহাকে সত্বর তোমার নিকট আনিয়া দিব। এতদিনে বুঝি মহামায়া আমার বাক্যের সত্যতা সম্পাদন করিলেন। এই দরাফ খাঁই যে তাঁহার পুত্র, এখন বেশ বিশ্বাস হইতেছে; দরাফ যে কেমন করিয়া এখানে আসিয়াছে এবং কিরূপ অবস্থায় যে যবন গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছে—তাহা ত আমি বিশেষরূপে জানি, মা! মহামায়া তোমারই মায়ায় জগৎ মুগ্ধ—এ জগত তোমারই মায়া পরিচালিত, মা বাসন্তীর হতাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার কর! দরাফকে উৎসাহিত করিবার জন্য রামানন্দ বলিলেন—বৎস! দেবতা কখন পৃথক হইতে পারেন না। হিন্দুর দেবতা যিনি, মুসলমানের দেবতাও তিনি, তবে হিন্দুরা কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম ব'লে তাঁকে ডাকে আর মুসলমানেরা আল্লা, খোদা, পীর বলে ডাকে—বিভিন্নতা কেবল এই নামের মধ্যে রহিয়াছে; দ্রব্যের মধ্যে কান পার্থক্য নাই; দিল্ সাচ্চা করিয়া ডাকিতে পারিলে রাম রহিম যে একই বস্তু তাহাতে আর সন্দেহ নাই; ভক্তিভাবে ভগবানকে ডাকিলে মুসলমানেরও যে গতি, যেরূপ মুক্তি যেরূপ স্বর্গ-প্রাপ্তি হইবে—হিন্দুর তাই হইবে; ভক্তকে মুক্তি প্রদান করিতে, তাহাকে পদাশ্রয়ে আশ্রয় দিতে ভগবানের কোন আচার বিচার নাই; এ বিষয়ে তাঁহার নিকট ভিন্ন ভাব বা পার্থক্যও নাই; তিনি পতিত পাবন; তুমি যে জাতিই হও, আর্ত্ত পতিত হইয়া ভক্তিভরে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেই তোমার উদ্ধার সাধন অনিবার্য্য। আরও দেখ মায়ের নিকট বা বাপের নিকট সন্তানের আবার ভেদজ্ঞান কি? ভাল ছেলেটী

পিতামাতার যেমন প্রিয়, মন্দটাও তেমনি। আদ্যাশক্তি মা আমার বিশ্বপ্রসবিত্রী জগজ্জননীরূপে এই বিশ্ব প্রসব করিয়াছেন—এই বিশ্বস্থ মানব মাত্রেই তাঁহার প্রাণের সন্তান—আঁতের ধন। আমরা জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সামাজিক নিয়ম ও দেশাচার অনুসারে হিন্দু মুসলমান রূপে বিভক্ত হইয়াছি ; কিন্তু সাধন ক্ষেত্রে তাঁহার স্বাতন্ত্র নাই। হিন্দু যদি আল্লা বা খোদা বলিয়া ভগবানকে একবার ডাকিয়া ফেলে তাহা হইলে সে কি পতিত হইয়া যাইবে, না মুসলমান একবার দুর্গা কালী নাম উচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্বা অপবিত্র হইয়া যাইবে ? এ সকল দুশ্চিন্তা কখনও মনোমধ্যে স্থান দিও না। দেশকাল-পাত্র ভেদে সলিল যেমন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়, ভগবানও তেমনি ; নতুবা হিন্দু যাঁহাকে ডাকে, মুসলমানও তাঁহাকেই ডাকে—অন্তে তাহারই পাদপদ্মে লীন হয়। বৎস! ইহার জন্য মনের মধ্যে একটা বৃথা সন্দেহ আনয়ন করিয়া অস্থির হইও না ; প্রাণ যাহাতে তদ্গত হয়, তাহার পর্য্যালোচনা করাই শ্রেয়। মুসলমানগণ জন্মজন্মান্তরের বদ্ধমূল ধারণা অনুসারে ভগবানকে খোদা বলিয়া তৃপ্তি লাভ করে, তাই ভগবান তাহাদের খোদা বা আল্লারূপে তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। হিন্দু মা কালী, মা গঙ্গা বা পিতা আশুতোষ ইত্যাদি বলিয়া তৃপ্তি লাভ করে, ভগবান তাহাদের সেইরূপেই দর্শন দিয়া কৃতার্থ করেন। এক্ষণে তোমার মনে যে এরূপ বৈরাগ্য হইয়াছে, ভগবৎপ্রাপ্তি সম্বন্ধে যে এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে-তাহার বিশেষ কারণ আছে!

দরাফ খাঁ সাগ্রহে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল—কি কারণ ঠাকুর, আমার কি শুনিবার অধিকার নাই ?

রামানন্দ। বৎস! অধিকার আছে বই কি, কিন্তু সে অতিশয় গোপনীয় কথা, শুনিলে তুমি বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইবে।

দরাফ। ঠাকুর! যদি কোন বাধা না থাকে, প্রকাশ করিয়া আমার চিত্তচাঞ্চল্য বিদূরিত করুন।

রামানন্দ কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন—বৎস! তোমার জন্ম সম্বন্ধে কোন প্রকার স্মৃতি মনোমধ্যে উদিত হয় কি?

দরাফ। ঠাকুর! আমি অতি শিশু অবস্থায় বাণের জলে ভাসিয়া আসিয়াছিলাম—আমার মা ছিলেন, তিনিও ভাসিয়া গিয়াছেন—ইহা ছাড়া আমার কিছু মনে নাই। তারপর ভুবনেশ্বরীর ও আপনার স্মৃতি কিছু কিছু মনে পড়ে।

রামানন্দ। তুমি কি যথার্থই মুসলমান বংশজাত, না অন্য কোন বংশে তোমার উদ্ভব?

দরাফ। ঠাকুর! সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চয় কিছু বলিতে পারি না; আমার কিছুই মনে পড়ে না।

রামানন্দ। বৎস! তুমি মুসলমান সন্তান নও; বিপ্রবংশ সম্ভূত—কেবল মুসলমান দ্বারা পালিত হইয়া মুসলমান হইয়াছ; তোমাদের বাটী বর্দ্ধমানের অন্তর্গত দামোদর নদের পশ্চিম সীমান্তে কেতলপুর গ্রামে ছিল—কেতলপুরের প্রসিদ্ধ রায়বংশে তোমার জন্ম—আমরা তোমাদের কুলগুরু ছিলাম। তোমার জননী মৃতা নহেন এখনও জীবিতা।

মৃত্যুর পর নবজীবন লাভ করিলে মানুষ যেরূপ আনন্দিত হয় হতাশের পর আশার সঞ্চার হইলে প্রাণ যেমন সুখস্পন্দনে স্পন্দিত হইতে থাকে, রামানন্দের মুখে তাহাদের বংশাবলীর কথা শুনিয়া এবং

তাহার জননী এখন জীবিতা আছেন শুনিয়া দরাফ আনন্দ গদগদ বচনে বলিল—প্রভু! আজ যাহা শুনিলাম—তাহার তুলনা নাই; কি বলিয়া তবে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাইব—তাহার ভাষা আমার ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তির রসনায় সংযোজিত হইতেছে না—ঠাকুর! কৃপা করিয়া আমার মাকে দেখান; তাঁহার পদ স্পর্শ করিয়া আমি মানব জীবন ধন্য করি—এই বলিয়া দরাফ আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিল।

রামানন্দ। বৎস! স্থির হও; একে একে সমস্তই পাইবে, তোমার সহধর্ম্মিণী ষোড়শীও যবন কন্যা নহে—সেও ব্রাহ্মণ কন্যা, ইহা আমি নিজেই জানি; ভুবনেশ্বরী তাহাকে নিরাশ্রয় দেখিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এক্ষণে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে তোমরা একত্রে সংমিলিত হইয়াছ।

দরাফ ভক্তি গদ গদ চিত্তে খোদার চরণে প্রণিপাত করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

রামানন্দ বলিলেন—বৎস! মুসলমান হইয়া গিয়াছ—তজ্জন্য চিন্তা করিও না চক্রীর চক্রে তুমি জাতিচ্যুত হইয়াছ, বিশেষ কোনও কার্য্যোদ্ধারের জন্যই এইরূপ ঘটনা সংঘটন হইয়াছে। পতিতপাবনী মা তোমায় উদ্ধার করিবেন—বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত ঘটনা তোমার চক্ষের সম্মুখে সংঘটিত হইয়াছে। এ সকল কথা আর কাহার নিকট প্রকাশ করিও না। তোমার স্ত্রীকে খুব গোপনে একথা শ্রবণ করাইবে—এবং তাহাকেও প্রকাশ করিতে নিষেধ করিবে। মুসলমান অবস্থাতেই তোমাদের মুক্তি হইবে, পূর্ব্বে বলিয়াছি সাধন ক্ষেত্রে জাতি বিচার নাই। মুসলমান সমাজের মুখোজ্জ্বল করিবার জন্যই খোদার এই লীলা খেলা। আমি রাজার নিকট হইয়া কিছুদিনের জন্য শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম

যাইব, ফিরিতে কিছু বিলম্ব হইবে। তুমি ইতিমধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের যাবতীয় তীর্থ পর্য্যটন করিয়া ছয় মাস পরে আমার অমৃত-সহরের কালীবাড়ীতে উপস্থিত হইলে—তথায় তোমার জননীর দর্শন পাইবে,—তারপর তোমায় আমি তান্ত্রিক মতে দীক্ষিত করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত করাইব। তান্ত্রিক মতে দীক্ষা গ্রহণ করিতে কাহারও বাধা নাই এবং ভক্তিভরে তাহার অনুশীলন করিলে—নিশ্চয় শ্রেয় লাভ করিতে পারিবে; আমি যতদূর জানিতেছি—তাহাতে পতিত পাবনীর কৃপা-লাভ তোমার পক্ষে অসম্ভব হইবে না।

এই বলিয়া রামানন্দ গাত্রোত্থান করিলেন;—দরাফ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নিতান্ত অনুগতের মত তাঁহাকে অভিবাদন করিল। রামানন্দ রজনীর শেষ যামে মহানাদ রাজবাটী অভিমুখে যাত্রা করিলে দরাফ খাঁ নিরাশ জীবন আশা পরিপূরিত করিয়া, আনন্দাপ্লুত হৃদয়ে সেই ছাউনীতলে শয়ন করিয়া আপন সৌভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। মানসিক দুশ্চিন্তায় যে হৃদয় পুড়িয়া যাইতেছিল—এক্ষণে সাধক রামানন্দের উৎসাহ বাক্য বারিবর্ষণে তাহা সুশীতল হইল, কি এক অভাবনীয় শান্তি সুখে দেহ পবিত্র হইয়া উঠিল। তিন চারি দিবস নিদ্রা বঞ্চিত দরাফ এক্ষণে ভূতলে পড়িয়াই বিরামদায়িনী নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। নিদ্রাঘোরে কত সুখস্বপ্ন দেখিয়া দরাফের প্রাণ আনন্দ বিভোর হইতে লাগিল। প্রভাতের প্রারম্ভেই যখন তাহার সুষুপ্তি স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল; তখন প্রকৃতিবেশ পরিষ্কার হইয়াছে, পূর্ব্বদিকে বালসূর্য্যের স্নিগ্ধ লোহিত কিরণ স্বর্ণলতার ন্যায় ভূতল স্পর্শ করত সবুজ ঘাসের উপর লুটোপুটি খাইয়া শিশির বারি অঙ্গে মাখিতেছে। দরাফ খাঁ শয্যা ত্যাগ করিল—ভাল করিয়া একবার

চক্ষু মার্জ্জিত করিয়া চারিদিক চাহিল—আজ যেন প্রকৃতি তাহার সৌভাগ্যোদয়ে হাস্য আস্যে আনন্দময় হইয়াছে। পবিত্র সলিল শিকর বাহী মৃদু সমীরণ তাহার অঙ্গের পুলক বর্দ্ধনের জন্য গাত্রের বসন, মস্তকের বাবরী কাটা কেশ গুচ্ছ লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে। দরাফ তাহার অভীপ্সিত দেবীর সলিলরূপ শ্রীঅঙ্গের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া কতকি ভাবিতে লাগিল। রামানন্দের কথায় তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে—দেবী তাহাকে কৃপা করিবেন। ইহা প্রত্যাদেশ বলিয়াই তাহার হৃদয়ে দৃঢ় সংবদ্ধ হইয়াছে; দেহস্থ সুপ্ত আত্মার বিবেকবাণী যেন তাহাকে বলিতেছে—দরাফ! ধন্য তুই, ধন্য তোর ঐকান্তিকতা, ধন্য তোর শ্রমশীলতা, এরূপ না হইলে কি এত শীঘ্র মনের একাগ্রতা আসিতে পারে। দরাফ দেবীর পদে মস্তক নত করিয়া উঠিল, ধীরে ধীরে তাহার জীবনমুক্তিদায়িনী জাহ্নবীর পবিত্র তটের মাটী অঙ্গে মাখিয়া গৃহাভিমুখী হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মাতা পুত্র।

ধর্ম্মশালা গিরিশৃঙ্গের পাদদেশ ধৌত করিয়া বিতস্তা নদী প্রবাহিত। পর্ব্বত সানুদেশে নানাবিধবৃক্ষ লতায় স্থানটীকে অতি মনোহর শোভায় সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে; নিসর্গের এই নিভৃত নিবাসে, পর্ব্বত গুহার স্থানে স্থানে সংসার বিরাগী যোগিগণের শান্তিময় তপোবন,—পর্ব্বতের পবিত্রতা জ্ঞাপন করিতেছে। সময়ে সময়ে নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া সাধু সন্ন্যাসিগণ এই আরাম প্রদ গিরি গুহায় আসিয়া বসবাস করেন, বিতস্তা তীরে সুন্দর বাঁধা ঘাটে বসিয়া প্রকৃতি শোভা সন্দর্শন করিলে বাস্তবিক ভাবুক প্রাণে ভাব নদীর উদ্দীপনা হয়, অসার সাংসারিক ভাবনা তিরোহিত হইয়া মন ভগবদ্-ভাবনায় ভোরপুর হইয়া উঠে।

সন্ধ্যা হইতে এখন বিলম্ব আছে; ভগবান মরীচিমালী আপনার প্রভাজালে অপহরণ করিয়া তখনও অস্তাচলের অনুগামী হন নাই; কাক কোকিল তখন শাখী শাখে বসিয়া সারা দিনের পরিশ্রম জনিত অবসাদ দূর করিবার মানসে কলরব করিতেছে। এহেন সময়ে বিতস্তার নির্জ্জন ঘাটে কোথা হইতে একটী সন্ন্যাসী যুবক আনমনে আসিয়া উপস্থিত হইল; সোপানে উপবেশন করিয়া প্রকৃতি শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিল। দীর্ঘজটাজুটে সন্ন্যাসীর মস্তক আবরিত, একটী গেরুয়া আচকান্ কণ্ঠ হইতে পদমূল চুম্বন করিতেছে; গলায় স্ফটিকের

মালা সূর্য্য কিরণে ঝকমক করিতেছে; হাতে একটী বংশদণ্ড, অপর হস্তে একটী নাতিক্ষুদ্র লোটা। যুবা সন্ন্যাসীর গঠন প্রণালী এবং দৈহিক সৌন্দর্য্য অতি পরিপাটী; তবে দেখিলে বোধ হয় অতিরিক্ত দেশ ভ্রমণ হেতু সে সৌন্দর্য্য রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় যেন কথঞ্চিৎ মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অল্প অল্প শ্মশ্রুরাজির মধ্য দিয়া ঘর্ম্ম ফুটিয়া মুখমণ্ডলের অনুপম শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে, সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া যুবক হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া নমাজ আরম্ভ করিলেন—ইহাতে বুঝা গেল যুবক হিন্দু নহেন, মুসলমান কুলোদ্ভব ফকির। যখন তাঁহার নমাজ শেষ হইল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে; আকাশে অষ্টমীর চন্দ্র তারকা পরিবেষ্টিত হইয়া কিরণ বিতরণ করিতেছেন। পথশ্রান্ত ফকির সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে দেখিয়া এবং এই অপরিচিত দুর্গম স্থানে তাহার রাত্রি বাসের কি ব্যবস্থা হইবে একবার ভাবিলেন কিন্তু বিচলিত হইলেন না, খোদার পাদপদ্মে অটল বিশ্বাস থাকায় বলিলেন—তাঁহার দয়ার রাজ্যে আশ্রয় স্থানের ভাবনা কি, এই আট মাস তিনি যেমন করিয়া রাখিয়াছেন—আজও সেইরূপ রাখিবেন। চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যুবক খোদার নামে হৃদয় সাহস বদ্ধ করিয়া বলিলেন—এই ত প্রভুর আদেশে হিন্দু মুসলমানের যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণ করিলাম, কত দেবালয়, কত মস্‌জিদ দেখিলাম—সকল স্থানেই ভগবানের অপূর্ব্ব লীলার মধুর মাধুরী বর্ত্তমান; শুনিয়াছিলাম—হিন্দুর দেবালয়ে মুসলমানকে প্রবেশ করিতে দেয় না কিন্তু আমাকেত কই কেহ নিষেধ করে নাই, আমিত অবাধে হিন্দুর সকল স্থানের দেবদেবী-গণকে দর্শন করিয়াছি। রজনী যোগে দেবালয়ে বা মস্‌জিদে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ত কই অপরিচিত বলিয়া আমার প্রতি কাহার

ঘৃণার উদ্রেক হয় নাই, এ সমস্ত তাঁহারই দয়া বলিতে হইবে। সে দিন জ্বালামুখীতে যেরূপ আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিলাম—বাস্তবিক তাহা বিস্ময়-কর; হিন্দুর দৈবী মাহাত্ম্য এখানে যেমন জাজ্বল্যমান, এমন আর কোথায় নাই; আমাদের জুম্মা মসজিদে অবস্থান করিলেও বাস্তবিক প্রাণে খোদার একটা অসীম মহান ভাব জাগিয়া উঠে। প্রভু রামা-নন্দের আদেশে এই তীর্থ পর্য্যটনে এতদিন কাটাইলাম কিন্তু যাহা মনে করিয়াছিলাম কই, তাহার হস্ত হইতে সম্যকরূপে ত পরিত্রাণ পাইতেছি না—প্রবৃত্তি ত এখন আমাকে সময়ে সময়ে জ্বালাতন করিতেছে? রামানন্দ বলেন—মতিয়া ও আমি হিন্দুর সন্তান, মুসল-মান দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি—আমার হিন্দু জননী এখন তাঁহার আশ্রমে বর্ত্তমান, দেশ পরিভ্রমণ করিয়া এইবার তাঁহার আশ্রমে যাইব, এখান হইতে তাঁহার আশ্রম বোধ হয় বেশী দূর নয়; স্থানটী ত অতিশয় নির্জ্জন, জনমানবের সাড়া শব্দ নাই—দূরত্বের বিষয় কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করি। সন্ন্যাসী এইরূপ চিন্তায় বিভোর হইয়াছেন। এমন সময় "হর হর মহাদেও" শব্দে বনস্থলী প্রকম্পিত করিয়া একজন সন্ন্যাসী বিতস্তা তীরে আগমন করিলেন; বহুক্ষণ নদীজলে অবগাহন করিয়া উপরে উঠিবার সময় যুবককে দেখিয়া গুরু গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"কৌঁও বেটা। রহনেকো জায়গা ঢুরতেহো, আও হামারা সাত।" যুবক অবনত মস্তকে সেই কৌপীনধারী দীর্ঘ জটাজাল বিলম্বিত, বিশালবপু সন্ন্যাসীর সহিত সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে ধর্ম্মশালার অধিত্যক অতিক্রম করিতে লাগিলেন। যুবা সন্ন্যাসী যে আমাদের সাধু ভক্ত দরাফ খাঁ তাহা বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন, রামানন্দের আদেশে সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া

আজ লাহোরে উপস্থিত হইয়াছেন! উদ্দেশ্য অমৃতসহরে রামানন্দ-আশ্রমে সর্ব্বতীর্থের সার মাতৃচরণ দর্শন।

মনের স্থিরতা ও পবিত্রতা আনয়ন করিতে হইলে উর্দ্ধরেতা হইয়া তীর্থ ভ্রমণ এবং সৎসঙ্গে কাল যাপন করা একান্ত বিধেয়—চপল মনকে গড়িয়া তুলিবার এমন উপায় আর নাই, তবে যাহার মন সহজেই চঞ্চলতা পরিহার করিয়াছে—তাহার কথা স্বতন্ত্র। দরাফ সন্ন্যাসীর সহিত একটী গুহা মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, সন্ন্যাসী যুবকের জ্যোতিঃপূর্ণ দৈহিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আপনার ভোজন সময়ে তাহাকেও নানাবিধ বন্যজাত সুস্বাদু ফলমূল প্রদানে পরিতুষ্ট করিলেন এবং দুইজনে পরমানন্দে নিশাযাপন করিলেন। প্রভাত কালে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—বেটা, আব্ কাঁহা যাওগে ?"

দরাফ বিনয় নম্র বচনে বলিলেন—"আমি অমৃত সহরে রামানন্দ আশ্রমে যাইব—আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক পথ দেখাইয়া দিন।

সন্ন্যাসী বলিলেন—"রামানন্দ নেহি রামদাস * বলো" প্রভুজী সব কইকো গুরু মহারাজ ; তুমারা ভি গুরুজী ?

দরাফ খাঁ সম্মতি সূচক মস্তক চালিত করিয়া বলিলেন—হাঁ৷ ঠাকুর সন্ন্যাসী অতিশয় আগ্রহের সহিত ফকিরকে পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে অমৃত সহরের পথ দেখাইয়া দিলেন।

দরাফ খাঁ ত্বরিত পদে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া পথ অতি-বাহিত করিতে লাগিলেন। আজ তাঁহার প্রাণ প্রফুল্ল, মন প্রফুল্ল

---

* এই রামদাস অমৃত সহরে শিকজাতির গুরু ছিলেন ; বাল্যকালে অবস্থান কালে কেহ কেহ তাঁহাকে রামানন্দ বলিয়া ডাকিত—এইরূপ প্রবাদ।

হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছে। অজ্ঞান শিশু-জীবনের কুয়াশাচ্ছন্ন কাল হইতে যে মাতৃচরণ দর্শনে দরাফ বঞ্চিত রহিয়াছে, যে আরাধ্য চরণে তাঁহার জীবন যৌবন এবং পার্থিব যাবতীয় সুখ সৌভাগ্য বিজড়িত, আজ সেই মাতৃচরণ, কৃতজ্ঞতা অশ্রুজলে ধৌত করত তাপিত হৃদয়ে ধারণ করিবেন—মনপ্রাণ সুশীতল করিয়া মাতৃপদে আজীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা, কামনা-বেদনা নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হইবেন, মাতৃহারা পুত্র আজ ত্রিশবৎসর মৃতা জ্ঞানে বিস্মৃত মাতার দর্শন পাইবে, ইহার তুল্য আনন্দ কি আর হইতে পারে, না ইহার তুল্য আনন্দ আর আছে? জগতের সমস্ত আনন্দ একত্রিত করিলেও যে ইহার শতাংশের একাংশ হইতে পারে না। তুমি হিন্দু হও, মুসলমান হও, বৌদ্ধ হও, খৃষ্টান হও; মায়ের ভক্তি, মায়ের পূজা তোমাকে করিতেই হইবে, এরূপ জননীর সুদীর্ঘকাল অদর্শনে যে কিরূপ যাতনা কিরূপ মনোবেদনা হয়—তাহা সকল জাতিই বিদিত আছেন? দরাফ মনের আবেগে অনন্যমনে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অনুমান কুড়িক্রোশ পথ অতিবাহিত করিয়া দরাফ পরদিন সন্ধ্যাকালে অমৃত সহরে উপনীত হইলেন। সহরটী অতি মনোরম। হিন্দু মুসলমানের নানা কীর্ত্তি এস্থানে বর্ত্তমান, অমৃতসহরের কালীবাড়ী অতি সুন্দর। তিনি সহরের শোভা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন। এখানকার অধিকাংশ কীর্ত্তিই রাজা রণজিৎ-সিংহ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে আফগান আমেদ শাহ শিখদিগের কীর্ত্তি-কলাপ নষ্ট করিয়া, যে সরোবরের নামানুসারে সহরের নাম অমৃত সহর হইয়াছিল তাহা মৃত্তিকার দ্বারা ভরাট করিয়া ফেলেন এবং অনেক প্রকার অত্যাচার করেন। পরে

১৮০২ সালে রাজা রণজিৎ পুনরায় ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়া শিখ-জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। সুবৃহৎ পঞ্চনদের মধ্যে অমৃত সহরের ন্যায় সুন্দর ও সুদৃশ্য নগর আর নাই।

চন্দ্রমা শালিনী রজনীতে নগরের শোভা দেখিতে দেখিতে অনেক বিলম্ব হইল; যখন চমক ভাঙ্গিল, তখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর অতীত, তিনি তাড়াতাড়ি অতীব আগ্রহের সহিত দুই একজনকে রামানন্দের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই বলিল—রামানন্দের বিষয় বলিতে পারি না, তবে প্রভু রামদাসের আশ্রম অদূরে। দরাফ ছুটিলেন—নগর ছাড়াইয়া একটী নিভৃত পল্লীতে আসিলেন—অন্ধকারে ইহার শোভা-সৌন্দর্য্য কিছু বুঝিতে পারা গেল না; পল্লীবাসী সকলেই গৃহাবরুদ্ধ, কেবল একখানি মুদীর দোকানে তখনও আলো জ্বলিতেছিল, দরাফ জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁ মশায়! প্রভু রামদাসের আশ্রম বলিতে পারেন? ভিতর হইতে উত্তর হইল—অদূরে উদ্যান বেষ্টিত কুটিরই তাঁহার আশ্রম।

দরাফ তাড়াতাড়ি তথায় গমন করিলেন—এবং বাতায়ন পথের মৃদু আলোক সাহায্যে দেখিতে পাইলেন—একখানি মৃগচর্ম্মে প্রভু উপবিষ্ট, পশ্চাতে সামান্য শয্যায় একটী প্রৌঢ়া একটী শিশুসহ শায়িতা, প্রভুর সম্মুখে একটী প্রৌঢ়া রমণী যেন কতই বিবশা, যেন কতই বিমনা, মলিন বদনে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—গুরুপুত্র! কই আপনি বল্লেন যে শীঘ্র তোমার হারানিধি মিলিয়া যাইবে, সে জীবিত এবং বেশ সুখে আছে কিন্তু জাতিচ্যুত হইয়া গিয়াছে; তাহাকে তীর্থ ভ্রমণে মনের দৃঢ়তা এবং কষ্ট সাহিষ্ণুতা শিক্ষা করিতে পাঠাইয়াছি; তীর্থ ভ্রমণ শেষ করিয়া সে বরাবর এখানেই আসিবে।

কই, ঠাকুরপুত্র! ছয় মাসের অধিক প্রায় আটমাস যে গত হইল, আর কতদিন বৃথা সান্ত্বনা বাক্যে এপোড়া প্রাণ রাখিব; সে কোথায় আছে, আমাকে বলিয়া দিন, আমি আজই তাহার কাছে যাইতে প্রস্তুত আছি। আর যে সহ্য করিতে পারি না, পুত্রশোকে যে আমার দেহ পুড়িয়া গেল? ইহা কি কেবলই স্তোক বাক্য?

ঠাকুরপুত্র।—না দিদি কমলা! স্তোক বা মিথ্যা বাক্য নহে। সে নিশ্চয়ই দেশ ভ্রমণ করিয়া এখানেই আসিবে, আমি তোমাকে লইয়া তাহার সহিত দেশে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিব। তবে দেশ পরিভ্রমণের কথা ত ঠিক বলা যায় না, কোথাও দুই একদিন বেশীও হইতে পারে। এই জন্য বিলম্ব হইতেছে—তবে তাহার জীবনের কোন আশঙ্কা নাই, আমি অভেদ্য কবচে তাহার দেহ আঁটিয়া দিয়াছি।

পার্শ্বস্থিতা প্রৌঢ়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—আচ্ছা দিদি! তুমি পুত্রের সহিত কেমন করিয়া থাকিবে, সেত জাতিচ্যুত হইয়া গিয়াছে।

কমলা। জাতিচ্যুত হইলেই বা দিদি! জীবিত আছে, চক্ষের সম্মুখে প্রত্যহ দেখিতে পাইলেও প্রাণ ঠাণ্ডা হয়; সে যে আমার নাড়ী-ছেড়া ধন, আজ ত্রিশ বৎসর নিরুদ্দেশ! এই বলিয়া কমলা কাঁদিতে লাগিলেন।

দরাফ বাহিরে দাঁড়াইয়া সমস্তই শুনিতেছিলেন—তাঁহার হৃদয়ের ভাব-সরোবর উথলিয়া উঠিতেছিল—আর চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন—মা-মা। এই যে তোমার হতভাগ্য পুত্র দ্বারে উপস্থিত; আমাকে কোলে নাও। দুর্ভেদ্য

দুরন্ত অন্ধকারে হঠাৎ আলোক বিকাশ হইলে পথিক যেমন চমকিত হয়—কমলা তদ্রূপ চমকিত হইয়া ভাবাবেগে অবসাদ হইয়া আনন্দে দিশাহারা হইয়া গেলেন; ঘরের দ্বার খুঁজিয়া পাইলেন না—কেবল কই বাবা, কোথায় বাবা. আয় বাবা, বলিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। রামানন্দ কমলার পুত্রস্নেহের পবিত্র উন্মাদনা দেখিয়া মুগ্ধ চিত্তে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দরাফকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কমলা উন্মাদিনীর ন্যায় উধাও হইয়া আসিয়া পুত্রের গলা জড়াইয়া একেবারে চৈতন্য হীনা হইয়া পড়িলেন। সেই স্বর্গীয় আলিঙ্গনের শীতলতা স্পর্শে দরাফেরও চৈতন্য রহিত হইয়া গেল। রামানন্দ ও তদীয় পত্নী আনন্দময়ী শীতল জলসেকে উভয়ের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। তাহার পর মাতাপুত্রের আদর আপ্যায়ন, স্নেহাভিভাষণ; আনন্দাশ্রুতে উভয়ের চক্ষু ভাসিয়া যাইতেছে; তথাপি বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চারিচক্ষের চাহনি, মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই—অথচ সাদর সম্ভাষণের এদৃশ্য অতুলনীয়, তুলিকার সাধ্য নাই বা ভাষায় এমন শব্দ নাই, যাহার দ্বারা এদৃশ্য-পট অঙ্কিত করিয়া পাঠককে সন্তুষ্ট করিতে পারা যায়। মনোনয়নের এ অপূর্ব্ব স্বর্গীয় দৃশ্য ভুক্তভোগী ভাবুক পাঠক মনে মনে অনুভব করুন।

সমস্ত রাত্রি এরূপ মহানন্দে কাটিয়া গেল—যে নিদ্রাদেবী আর কাহারও নয়ন ফলকে আবির্ভূতা হইয়া ক্ষণকালের জন্য এ আনন্দের বিরাম প্রদান করিলেন না। পরদিন মাতা পুত্রে ত্রিবেণী যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। রামানন্দ তাহাদের রাখিয়া আসিবেন, এইরূপ স্থির হইল। হারানিধি ত পাইলাম—পুত্রবধূ ও পৌত্রমুখ নিরীক্ষণ

করিতে পারিলেই জন্ম সার্থক হয়। কমলার আর বিলম্ব সহ্য হইতেছে না। দরাফ খাঁও অত্যন্ত উতলা হইয়াছেন, কারণ বহুদিন হইল তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইবার দিন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে মতিয়া অদর্শন-জনিত কষ্টে এবং নানা প্রকার সন্দেহে কোন অঘটন ঘটাইয়া না বসে। স্বামীর ধর্ম্মপথের কণ্টক হওয়া পত্নীর উচিত নহে বলিয়া মতিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল এবং এ অসহ্য অদর্শন যাতনাও সে অম্লান বদনে সহ্য করিয়া আছে। ছয় মাসের স্থানে এক্ষণে আট মাস অতীত প্রায়—সে হয়ত নানাবিধ দুশ্চিন্তায় আত্মহত্যা করিয়া ফেলিতে পারে। দরাফ রামানন্দকে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। মতিয়ার স্বামি-প্রেম কিরূপ প্রগাঢ় এবং ঐকান্তিকতাপূর্ণ রামানন্দ তাহা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন, দরাফের কথা শুনিয়া বলিলেন—বৎস! আমি মহামায়ার পূজাদির ও গৃহ রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছি, এক্ষণে চল মাতৃনাম স্মরণ করিয়া আমরা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হই। এই বলিয়া পত্নীপুত্রকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া রামানন্দ দরাফ ও তদীয় জননীর সহিত বাহির হইলেন।

পথে যাইতে যাইতে কমলাকে ছলনা করিবার জন্য রামানন্দ বলিলেন—কমলা দিদি! দরাফ জাতিচ্যুত হইয়াছে—এক্ষণে তুমি তাহার সহিত কেমন করিয়া একত্র বাস করিবে?

কমলার মুখ বিষণ্ণ হইয়া গেল বটে তথাপি তিনি সহজ ভাবে উত্তর করিলেন—দাদা! আমার ত আর অগ্রপশ্চাৎ চাহিবার কেহ নাই; কোন পুত্র কন্যার ত বিবাহ দিতে হইবে না যে দরাফের জন্য সমাজ আমাকে এক ঘরে করিবে। দরাফ যে জাতিই হউক না কেন, আমি ত তাহার গর্ভধারিণী; বিধির বিপাকে যাহা হইয়াছে—তাহার ত

আর উপায় নাই, তিনি যে তাহাকে জীবিত রাখিয়াছেন—ইহার জন্য তাঁর পদে আমার কোটী কোটী প্রণাম।' জাতি না থাক—ধর্ম্ম না যাইলেই হইল। দরাফ ও বধূমাতা অনাচারী না হইলেই আমি তাহাদের সহিত একত্র থাকিতে পারিব। আচার-ব্যবহারেইত হিন্দু-মুসলমান, নতুবা অপর কোন পার্থক্য ত নাই।

মাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া দরাফের বদন মণ্ডল বিশুষ্ক হইয়া গেল, তাহার আচার ব্যবহার ত ঠিক হিন্দুর মত নহে; তবে উপায়? দরাফকে বিষণ্ণ চিত্ত দেখিয়া রামানন্দ বলিলেন—কমলে! তোমার বধূমাতার আচার-ব্যবহার হিন্দু-স্ত্রী অপেক্ষাও অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ, মায়ের যেমন রূপ—গুণও তদ্রূপ আছে। কেবল দরাফকেই ভয়, যাহা হউক, আমি তথায় যাইয়া সে বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিব। দরাফ যাহাতে তোমার অনুরূপ হয়—যাহাতে সদাচারী হইয়া থাকিতে পারে, সইত মত ধর্ম্ম-কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিয়া দিব। ইত্যাদি প্রকার বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া তাহাদের সহিত গমন করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

জন্মদোষে।

দরাফ বাটীতে আসিয়াছে। বহুদিন পরে স্বামীর পাদপদ্ম দর্শন করিয়া মতিয়ার বিশুষ্ক হৃদয়সরোবরে আনন্দের তুফান বহিতে লাগিল। রামানন্দ মতিয়ার নিকট কমলার পরিচয় প্রদান করিলে গুণবতী মতিয়া শাশুড়ীর পদধূলি গ্রহণ করতঃ শশব্যস্তে ভৃঙ্গারে জল আনিয়া তাঁহার পদধৌত করিয়া দিলেন। কমলা এতক্ষণ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে নির্ব্বাক্ হইয়া কেবল বধূমাতার কমনীয় কান্তি এবং অনিন্দ্যসুন্দর দৈহিক গঠনপ্রণালী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন—এক্ষণে তাহাতে নানাবিধ সদ্গুণের সমাবেশ দেখিয়া মুগ্ধান্তঃকরণে কোলে টানিয়া লইয়া বক্ষে ধারণ করিলেন এবং বলিলেন—মা! আমি আজ বহুদিন হইতে বৎসহারা গাভীর মত এদেশ ওদেশ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম—এক্ষণে সোদরসম রামানন্দের কৃপায় তোমাদের লাভ করিয়া যে কত আনন্দিত হইলাম—তাহা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমার নাই! তুমি জন্মায়তী হও—এই বলিয়া আনন্দাশ্রুনীরে বধূমাতার অভিষেক করিলেন। তৎপর আসলের সুদ স্বরূপ ননীর পুতলী পৌত্রটীকে কোলে লইয়া নানাপ্রকারে আদর করিতে লাগিলেন।

দরাফ তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে—আসিবার সময় অমৃতসহরে গুরুগৃহে তাহার নিরুদ্দিষ্টা জননীর দর্শন পাইয়া গৃহে আনিয়াছে শুনিয়া সুহৃদ্বর্গ সকলেই দেখিতে আসিল। কতলোকে কত কথা

বলিতে লাগিল—কেহ দুঃখিত, কেহ বা সুখ লাভ করিয়া আপন আপন ভবনে গমন করিল। মতিয়ার সমবয়সী সকলে সুখস্রোতে ভাসিতে লাগিল। তখন সংসারে একাকিনী বসিয়া মতিয়া বেশীক্ষণ তাহাদের সহিত খেলায় অতিবাহিত করিতে পারিতেন না, এক্ষণে তাহার শাশুড়ী আসিয়াছে—এইবার তাহারা অনেকক্ষণ ধরিয়া সাধুসহবাসে কালযাপন করিয়া কত উপদেশ পূর্ণ মধুর গল্প শুনিবে, কত হাসি তামাসায় হৃদয়ে অতুল সুখানুভব করিতে পারিবে—এই জন্য তাহারা সকলেই এক নূতন আনন্দে আত্মহারা হইল। সওদাগর ক্ষেত্রে গিয়াছিল—দরাফের আগমন শুনিয়া আনন্দে উঠিপড়ি করিয়া ছুটিয়া বাড়ী আসিল। দরাফ বহুদিনের পর নানাকে দেখিয়া বিনয়-নম্র-বচনে শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। সওদাগর অশ্রুনীরে বুক ভাসাইয়া খোদাকে অশেষবিধ ধন্যবাদ দিতে লাগিল। ইহার পর দরাফ জননীর নিকট সওদাগরের পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন—মা! আমাদের আশ্রয় দাতা মেহের আলীর মৃত্যু পর এই বৃদ্ধের অসীম স্নেহের-আবরণে আমরা নানাবিধ ভীষণ বিপদার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইয়া রক্ষা পাইয়াছি, ইনি আমাদের অসহায়াবস্থার রক্ষা কর্ত্তা ; ইহার আপনার বলিতে কেহ না থাকিলেও আমাদের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া এই বৃদ্ধ বয়সেও প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছেন।

কমলা আনন্দাশ্রুপ্লুত নেত্রে বলিলেন—হে ভদ্র! যাহা করিয়াছ, এজগতে তাহার বিনিময় নাই—এক্ষণে তুমি আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর, এই বলিয়া করযোড়ে অভিবাদন করিলেন। বৃদ্ধও প্রত্যভিবাদন করিল। এইরূপে অতুল আনন্দে সমস্ত দিবা অতিবাহিত হইল ; দিবসের আহারাদি করিতে সেদিন সকলেরই ভুল হইয়া গেল।

অপরাহ্ন সময়ে আহারের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। রামানন্দ বলি-লেন—আমি রণধীরের আশ্রয়ে যাইতেছি, তুমি কমলাকে স্বতন্ত্র গৃহে আহারীয় দ্রব্যাদি প্রদান কর—উনি স্বপাকে আহারাদি করুন; তারপর দুই একদিন অতিবাহিত হইলে আমি ইহার ব্যবস্থা করিব। যাইবার সময় অতি গোপনে দরাফকে অনাচার সকল পরিবর্জ্জন করিতে আদেশ করিলেন।

এই রূপে দুই দিন কাটিয়া গেল। কমলা প্রত্যহ গাত্রোত্থান করিয়া গঙ্গাস্নান, পূজাহ্নিক সমাপন করত স্বপাকে একবেলা আহার করেন—পরে পুত্রের গৃহে আসিয়া তাহার গৃহ-কর্ম্মের সমস্ত তত্ত্বাবধান করিয়া দেন। মাতা পুত্র এবং পুত্রবধূ সকলেই সন্তুষ্ট হইল বটে কিন্তু এত ব্যবধান যেন তাহাদের অত্যন্ত কষ্টকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই জন্য প্রত্যহ দরাফ খাঁ রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইহার একটা প্রতিকার কল্পে সৎ উপদেশ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাজা রণধীর বলিলেন—বৎস! উপায় ত কিছুই নাই, গুরুদেব কি করিবেন? হিন্দু সকল ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু অন্য কোন জাতি হিন্দু হইতে পারে না; জাতিচ্যুত হইয়া দ্বাদশবর্ষ উত্তীর্ণ হইলে আর কোন উপায় নাই। তোমার আকর অর্থাৎ জন্ম তোমায় হিন্দুত্বের দিকে টানিতেছে, কিন্তু আজন্ম মুসলমান-প্রতিপালিত-স্বভাব তাহার প্রতি-কূলাচরণ করিতেছে—যেভাবে আজন্ম গঠিত হইয়া আসিয়াছ—যে স্বভাব তোমার অস্থিমজ্জাগত হইয়াছে—তাহার ব্যতিক্রম করা অসাধ্য। তোমার স্বভাব কিছুতেই পরিবর্ত্তন হইবে না—স্বভাব মরিলেও পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব নহে। রামানন্দ দরাফকে অত্যন্ত ম্রিয়মান দেখিয়া বলিলেন—বৎস! যাহা হইবার নয় তাহার প্রতিকার

কিরূপে হইবে? আর তাহার জন্য তোমার এই উৎকণ্ঠাই বা কেন? মানুষ ধর্মকর্ম বজায় রাখিয়া মনুষ্যত্ব লাভের জন্য এ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে, বিশ্বাস ভক্তি হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া ভগবান লাভ করাই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা, জাতিবিচার একটা সামাজিক নিয়ম; ভগবৎ প্রাপ্তির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। শাস্ত্রে কি এমন কোনও নিয়ম আছে—যে কেবল হিন্দুই ভগবান পাইবে আর ভক্তিভরে অন্যজাতি তাঁহাকে ডাকিলে তাঁহার দয়া হইবে না, তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না? হিন্দুই কি তাঁহার সন্তান আর মুসলমান বা অন্য জাতি কি তাঁহার সন্তান নহে? এ সংশয় তুমি কেন বৃথা মনে আনিয়া মনকে সন্দেহ দোলায় দুলাইতেছ? ভগবানের নিকট জাতি বিচার নাই, ভক্ত যে জাতিই হউক না কেন; ভগবান তাঁহার নিকট চিরবিক্রীত।

আমাদের বেদও যেমনি অপৌরুষেয় ব্রহ্মের মুখ নিঃসৃত, মুসলমানদের কোরাণও তদ্রূপ—বেদে আর কোরাণে, এ সকল কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে—তজ্জন্য তুমি দ্বিধাবোধ করিও না। তবে তুমি পূর্ব্বে রাখালের মৃত্যুতে ভীতচিত্ত হইয়া নিজের উদ্ধারের বিষয়ে যে নিরাশ হইয়াছ—তদ্বিষয় আমি তোমাকে তন্ত্র শাস্ত্র হইতে কতকটা উপদেশ দিব—যাহাতে তুমি ভগবতী গঙ্গাদেবীকে প্রসন্ন করিতে পার, কিন্তু বৎস! যে দিকেই যাও, যাহাই কর—বিনা ভক্তিতে মুক্তির কোন সম্ভাবনা নাই। তুমি এক্ষণে খোদার নামে ভক্তি বিশ্বাস-যুক্ত হইয়া আজীবনের স্বভাব পরিপুষ্ট কর—তারপর আমি কিয়দ্দিনের মধ্যে সস্ত্রীক তোমাকে তান্ত্রিক দীক্ষা প্রদান করিব—তাহাতে কোন জাতি ভেদ নাই। আমি তোমাদের কুলগুরু অবশ্যই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ

করিব কিন্তু খোদার নামে নমাজ পড়িতে অবহেলা করিও না, রাম—রহিম একই বস্তু সেই পরব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহেন।

দরাফ। প্রভু! আপনারাই ত বলেন—কারণ না থাকিলে কার্য্য হয় না, আচ্ছা, আমাকে যে হিন্দু হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইল, তাহাদের যাবতীয় হাব—ভাব, স্বভাব যে আমার অস্থিমজ্জাগত হইল, ইহার কি কোন হেতু নাই?

রামানন্দ। বৎস, অবশ্যই আছে; তোমার জন্ম সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, নতুবা এমন হইবে কেন, একজাতিতে জন্মিয়া আর এক জাতিতে পরিণত হওয়া নিশ্চয়ই জন্ম-দোষ। জননীত তোমার নিকটে আছেন, গুপ্তভাবে একদিন এ বিষয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সদুত্তর পাইতে পারিবে। অন্যে এ বিষয় কেমন করিয়া বলিবে?

দরাফ আর কোন কথা বলিলেন না—প্রাণে একটা বিষম সন্দেহের বোঝা বহিয়া তিনি সেদিন বাড়ী আসিলেন। নমাজাদি পাঠ করিলেন—পাঠের সময় খোদার পদে ভক্তি গদগদচিত্তে কাঁদিতে কাঁদিতে কত প্রাণের দুঃখ জানাইলেন—ইহাতে তাঁহার হৃদয়ভার কতকটা লাঘব হইলে—আহারাদি করিয়া ক্ষেত্রের কাজ কর্ম্ম দেখিতে গমন করিলেন। সেদিন সন্ধ্যা হইতে না হইতেই দরাফ আসিয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন জননী আসিয়া অবধি তিনি মদ্যমাংস গ্রহণ করেন না বটে কিন্তু মোল্লা-পাড়ার নিকট দিয়া ক্ষেত্রে যাইবার সময় তাঁহার প্রাণ যেন কেমন করিয়া উঠে—আর যেন থাকিতে পারেন না—মন অস্থির হইয়া বাহির হইবার উপক্রম করে। যেন ইহার জন্য দরাফের শরীর এ কয়দিন তত ভাল নয়—স্বভাবের মাথায় একেবারে বাড়ী মারিয়া তিনি যেন অতিশয় মুহ্যমান

হইয়াছেন। মতিয়া স্বামীকে শয়ন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁগা! আজ এত সকাল সকাল শুইলে কেন—কোন অসুখ হয়েছে কি?

দয়াফ। হাঁ, মতিয়া! আজ শরীরটা তত ভাল নয়!

স্বামীর শরীর ভাল নয় শুনিয়া সতী পুত্রকে ঘুম পাড়াইলেন—স্বামীর পদতলে বসিয়া পদসেবা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে স্বামী তন্দ্রাভিভূত হইয়াছেন দেখিয়া ভিন্ন গৃহে শাশুড়ীর তত্বাবধান করিয়া পতির পদতলে আসিয়া শয়ন করিলেন—শাশুড়ীকে স্বামীর পীড়ার কথা কিছু বলিলেন না—কারণ মতিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন নিত্য-অভ্যাস একেবারে ছাড়িয়া দিয়া এইরূপ হইয়াছে। তিনি স্বামীকে বাতাস করিতে করিতে নিদ্রাভিভূতা হইয়া পড়িলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সন্দেহ ভঞ্জন।

গভীর রজনী; প্রকৃতি গম্ভীর-ভাবে রজনীর ভীষণতা পরিব্যাপ্ত করিতেছে, ধরিত্রী-কোলে সকলেই ঘুমঘোরে অচেতন। কেবল দয়াফের নিদ্রা নাই। তিনি না ঘুমাইলে মতিয়া ঘুমাইবে না বলিয়া এতক্ষণ কপট নিদ্রায় পড়িয়াছিলেন। অশান্তির আধার চিন্তা যার সহচরী, আরাম দায়িনী নিদ্রা তার কোথায়!

রামানন্দ প্রমুখাৎ শ্রুত সেই অতীব ভীষণ বাণী! "জন্মে কোনও ব্যাঘাত ঘটিয়াছে,—জননীকে জিজ্ঞাসা করিও"। এই চিন্তায় দরাফের চিত্ত অস্থির—মর্ম্মস্থল দগ্ধ হইতেছে, হায়! এ কথা মায়ের নিকট কি করিয়া প্রকাশ করিব, কি দোষ! মা কি আমার ব্যাভিচারিণী! তবে কি আমার জন্ম মুসলমান ঔরসে! যদি তাহা হয়, জারজের দেহ রক্ষায় ফল কি, এখনি ইহার পতন করিব—ব্যভিচারিণীকেও এ ধরাপৃষ্ঠ হইতে চির অবকাশ প্রদান করিব।" এই বলিয়া দরাফ জলন্ত ক্রোধমূর্ত্তি কথঞ্চিৎ সাম্য করিয়া একখানি দা হস্তে মাতৃ গৃহের দ্বারে করাঘাত করিলেন। পুত্রপ্রাণা কমলা তখনও ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলেন—হারানিধি প্রাপ্ত হইয়া অবধি ব্রহ্মচারিণী প্রতিদিন রজনীর নির্জ্জন যামে এইরূপ ইষ্টতুষ্টি করিয়া থাকেন। দ্বারে শব্দ হইবা মাত্রই চমকিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেও দরাফ, না মতিয়া!

দরাফ। না মা, আমি!

কমলা। কেন, বাবা এত রাত্রে, এখন জাগিয়া আছ কেন?

সেই কোমল স্বরে দরাফের রোষবহ্নি কতকটা প্রশমিত হইল। সে নম্র স্বরে বলিল—মা! গোটা কতক কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। আপনার নিদ্রার কোন ব্যাঘাত হলো কি?

"না বাবা" বলিয়া পুত্রগত প্রাণা জননী অর্গল মোচন করিলেন।

দরাফ ভিতরে প্রবেশ করিয়া কোশাকুশি দেখিয়া বলিলেন—মা! তবে ত ভাল কাজ করি নাই।

কমলা। তার জন্য ভাবনা কেন বাবা, এখন ত সমস্ত রজনী আছে!

জননীর ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া তাহার সন্দেহ ভঞ্জনে আর প্রবৃত্তি হইল না—এ মা কি কখন ব্যাভিচারিণী হইতে পারেন? তথাপি গুরুর আদেশ একবার জিজ্ঞাসা করিয়া ত সন্দেহ ভঞ্জন করিতেই হইবে—নতুবা তাহার তান্ত্রিক দীক্ষার উপায় নাই।

পুত্রকে নীরবে থাকিতে দেখিয়া মাতা বলিলেন—বাবা! কেন, এলি রে—কি হয়েছে বল, শরীর অসুস্থ হয়েছে নাকি?

দরাফ। মা! শরীর চিরদিন অসুস্থ, ইহজীবনে আর সুস্থ হইবে না—আমি জাতিচ্যুত হইয়া বংশের জল গণ্ডুষ পর্য্যন্ত যখন লোপ করিলাম, তখন আর এ জীবনে ফল কি?

কমলা। বৎস! এখন আর সে বিষয় চিন্তা করিয়া কি হইবে? তুমি স্ব ইচ্ছায় ত কর নাই, বিধিচক্রে হইয়া গিয়াছে, দোষ কার!

দরাফ। মা! কারণ না থাকিলে কার্য্য হইতে পারে না; গুরুদেব বলিলেন অবশ্যই তোমার জন্ম কোন দোষ দুষ্ট হইয়াছে, তাহা তোমার জননী ভিন্ন কেহ বলিতে পারিবে না—অতএব তুমি ত সমস্তই জান, আমার জন্মবৃত্তান্ত কি, প্রকাশ করিয়া বল—নতুবা আমি এই দার দ্বারা আত্মহত্যা করিয়া মরিব—এ পিতৃ-কুলের নাম লোপকারী, নগণ্য জীবন আর রাখিব না।

কমলা মহা বিভ্রতে পড়িলেন, পুত্রের এ দারুণ আবদারে তিনি বহুক্ষণ নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া নিজ চরিত্রের যাবতীয় পূর্ব্ব ঘটনা চিন্তা করিতে লাগিলেন কিন্তু মনের অগোচর ত পাপ নাই, এমন কোনও কলঙ্ক কালিমাময় ঘটনা তাঁহার মনে উদয় হইল না, যাহার দ্বারা এমন একটী দারুণ দুর্দ্দৈব সংঘটন হইতে পারে? যদিও তিনি অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন, একমাত্র পুত্র প্রসবের পর যদিও তাঁহার

স্বামি বিয়োগ হইয়াছে তথাপি তাঁহার চরিত্র আজীবন নিষ্কলঙ্ক, ভাগিরথী সলিলের ন্যায় পরম পবিত্র, ইহার মধ্যে কোথাও কোন অপবিত্রতার লেশ মাত্র খুঁজিয়া পাইলেন না। পুত্র প্রসবের পূর্ব্ব হইতে এখন পর্য্যন্ত সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া মনে করিলেন, আদ্য ঋতুর বিষয় মনে করিলেন। তাহার পর বলিলেন—বাবা! আমার চরিত্রে কখন কোন প্রকার দোষ স্পর্শ করে নাই; পাড়ার গৃহিণীগণ আমার দৃষ্টান্ত দিয়াই তাহাদের বধূ সকলকে শিক্ষা দিতেন, এ বিষয় ঠাকুর পুত্র রামানন্দও বেশ জানেন—উনি তখন গুরুদেবের সহিত আমাদের বাটীতে আগমন করিতেন। কর্ত্তা (তোর স্বর্গীয় পিতা) গুরুদেবকে নিজের আলয়ে রাখিতে পারিলে—অহরহ তাঁহার পাদপদ্ম দেখিতে পাইলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন; আমার চরিত্র বিষয়ে তাঁহার কিছুই অবিদিত নাই, পাপ কখন ছাপা থাকে না, দুষ্ট চরিত্রা হইলে একদিন না একদিন উহা প্রকাশ হইয়া নিশ্চয়ই তাঁহার কর্ণগোচর হইত। তবে তোমার জন্মের পূর্ব্বে একদিন ঋতুচতুর্থ দিবসে অতি প্রত্যুষে আমি নদীতে স্নানার্থে গিয়াছিলাম—আমাদের বাটীরপার্শ্বে দামোদরের একটী ঘাট, তাহাতে আমরা স্নানাদি করিতাম—তোমার পিতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, বিদায় আদায়েই আমাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত; সে দিন দূরদেশে একটী বিদায় ছিল বলিয়া আমি তাড়াতাড়ি স্নান কার্য্য সমাধা করিয়া সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিতে যাইব, ঠিক সেই সময় প্রতিবেশী একজন ভদ্র মুসলমান ঘাটে স্নানার্থ সমাগত হইয়াছিল—আমি তাহাকেই প্রথম দর্শন করিয়াছিলাম—তারপর সূর্য্য প্রণাম করিয়া বাটী আগমন করি; আমার জীবনের মধ্যে এই স্মৃতিটিই ত ক্ষীণ ভাবে আমার প্রাণে উঁকী মারিতেছে, ইহা ছাড়া জীবন-জমীনের

প্রত্যেক স্তর তন্ন তন্ন করিয়া অন্য কোন প্রকার অনাচার খুঁজিয়া পাইলাম না, ইহাতে তোমার যাহা অভিলাষ হয় কর।

দরাফ জননীর পূত চরিত্রের বিষয় অবগত হইয়া এবং তাঁহাকে বৃথা কষ্ট দিয়াছে দেখিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন—মা! আমি কল্যই রামানন্দের নিকট তোমার কথামত সমস্ত কথা ব্যক্ত করিব; ইহাতে আমার জন্ম যে কি দোষ সংস্পর্শ করিয়াছে—তাহা জানিয়া আসিব। ইহাতে যে কোন প্রকার দোষ হইতে পারে, তাহা ত আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠা কঠিন। এই বলিয়া দরাফ প্রভাতের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং উষা সমাগম হইতে না হইতেই প্রাণের উৎকণ্ঠায় তিনি মহানাদ গ্রামে রাজা রণধীরের প্রাসাদে রামানন্দের সন্ধানে চলিলেন।

রাজা রণধীর সামন্ত ও রামানন্দের তখনও প্রাতঃসন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ হয় নাই দেখিয়া দরাফও একস্থানে আপনার প্রাতঃকালীন নমাজ পাঠ শেষ করিয়া লইলেন। দরাফ এত অনাচারী, এত প্রবৃত্তির দাস ছিলেন কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মের বিধান অনুসারে তিনি দিবসে পাঁচবার নমাজ করিতে একদিনের জন্য বিস্মৃত হন নাই—ইহাতে সমূহ ক্ষতি হইলেও দরাফ তাহাতে বিচলিত হইতেন না। জগতে সমস্তই খোদার দান—তাঁহার নাম করিতে যদি কিছু ক্ষতি হয়, তাঁহার দ্বারাই আবার পূর্ণ হইবে—তবে ধর্ম্মকর্ম্মে অবহেলা করিব কেন! যাহার অন্তরে ভগবানের প্রতি এরূপ অচল অটল বিশ্বাস, সে কি সামান্য লোক! আজ নমাজের সময় তাহার তন্ময়তা অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে—দেহ কেবল পুলক পূর্ণিত হইতেছে; তাহার যেন মনে হইতেছে আজও সে ত্রিবেণীতীরে সেইরূপ ভাবে নমাজ করিতেছে; জাহ্নবীর তরঙ্গমালা যেন তাহাকে

ক্রোড়ে লইবার জন্য তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে, কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল ; এ দিকে রাজা রণধীরও গুরুদেব রামানন্দ সহ নিজের প্রকোষ্ঠে আসিয়া উপবেশন করিয়াছেন, এমন সময় দরাফ আসিয়া অভিবাদন করিলেন। তাঁহারা সমস্বরে দরাফকে বসিবার অনুমতি দিলেন। এ জগতে দরাফের ন্যায় সুঠাম সুন্দর যুবককে ভাল না বাসিবার লোক কেহ নাই। রাজা ও রামামন্দ তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন।

দরাফ বিষণ্ণ বদনে উপবেশন করিলে রামানন্দ হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস! সন্দেহ ভঞ্জন হইল কি ?

দরাফ। প্রভু! আমার মা সতী কি অসতী তাহাত আপনার অবিদিত নাই—তবে কেন বৃথা আমার জন্ম সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে-ছেন ; জ্যোতিষ শাস্ত্রে আপনি প্রধান পণ্ডিত এবং দৈবজ্ঞ, আপনি আমার নষ্ট-কোষ্ঠী উদ্ধার করিয়াছেন, এক্ষণে আপনি আমার সংশয় অপনোদন করুন।

রামানন্দ। বৎস! কোন কিছু কি তোমার জননীর মুখে শুনিতে পাইলে না ?

দরাফ। না প্রভু! তবে আমার জন্মাইবার পূর্ব্বে একদিন ঋতু স্নানের জন্য অতি প্রত্যূষে নদীঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিলেন এবং স্নান করিয়া সূর্য্য প্রণামের পূর্ব্বে ঘাটে একজন প্রতিবেশী ভদ্র মুসলমানকে স্নানার্থ আসিতে দেখিয়া ছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি আর কিছু বলিতে পারেন না।

রামানন্দ। বৎস! এই স্থানেইত সন্দেহ ভঞ্জন হইল, তিনি যে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-পালিনী, পরমধার্ম্মিকা রমণী তাহা আমি

সবিশেষ জানি, তবে এই স্থানে তোমার জন্মে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে ঋতুস্নানের পর সূর্য্য, অগ্নি, স্বামীর পাদপদ্ম বা দেবতার চিত্রপট প্রভৃতি দেখিবার নিয়ম আছে, তারপর সহবাস সময়ে স্বামি স্ত্রীর মনোগত ভাবানুসারেই পুত্রকন্যার দেহ গঠন হয়; ইহা বিজ্ঞান শাস্ত্র সম্মত সত্য, এই জন্য শাস্ত্রে গর্ভাধারণের কত সুনিয়ম বিধি বদ্ধ হইয়াছে—যাহাতে পুত্র কন্যাদি জন্মগ্রহণ করিয়া বংশের মুখোজ্জ্বল করিতে পারে। এখন সেইরূপ নিয়মে গর্ভাধান হয় না বলিয়া আমাদের এত অধঃপতন, আমাদের পুত্রকন্যাগণ এত অল্পায়ু এবং হীনবীর্য্য হইতেছে।

দরাফ। তবে কি সহবাসের সময় সেই ভদ্র মুসলমানের ভাব সম্বলিত চিত্র আমার জননীর মনে উদিত হইয়াছিল এবং তাহাতে আমার জন্ম হইয়াছে বলিয়া আমি জাতিচ্যুত হইয়াছি।

রামানন্দ। হাঁ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই এবং সেই জন্য তুমি মুসলমানের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া মুসলমান হইয়াছ। ইহা তোমার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। নতুবা তোমার পিতামাতা যে পরম পবিত্র চরিত্র, স্বধর্ম্মনিরত সাধু পুরুষ ছিলেন—তাহা আমি জানি। তবে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল অনুসারে—তোমার জীবন স্রোতের গতি এইরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কিন্তু তাহা বলিয়া দুঃখ কিসের, মুসলমান জন্মও কি জন্ম নয়; তাহারাও কি ভগবদ্ভক্ত হইলে ঈশ্বর লাভ করিতে পারে না? মানব জীবনের উদ্দেশ্য ত ঈশ্বর লাভ, তাহাতে ত তোমার কোন ব্যাঘাত হইবে না?

দরাফ। আচ্ছা প্রভু! ইহা কি আপনাদের জ্যোতিষ শাস্ত্রেরও

মত, আপনি গননা করিয়া আমার জীবন সম্বন্ধে কি এসমস্ত ঠিক করিয়াছেন ?

রামানন্দ। বৎস ! জ্যোতিষ শাস্ত্র কিছুই ছাড়িয়া দেন নাই। এই যে দেবগণ, নরগণ, রাক্ষসগণ এবং জন্মে বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণ পঞ্জিকাতে লেখা থাকে, তাহা সমস্ত ঠিক ; ঐ দিন ঐনক্ষত্রে জন্মাইলে তোমার পিতামাতার মনও ঠিক ঐভাবে গঠিত থাকিয়া তোমার জন্মদান করিবে। একজন শূদ্র নরগণ, বিপ্রবর্ণ হইয়া জন্মাইল, তুমি তাহার সমস্ত জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিও, সে শূদ্র ব্রাহ্মণের ন্যায় সাত্বিক ভাবাপন্ন হইবেই হইবে ; আবার একজন ব্রাহ্মণ দেবগণ, শূদ্রবর্ণ হইয়া জন্মাইল ; সে জীবনে কোন না কোন অংশে শুদ্র ভাবাপন্ন হইয়া পড়িবেই ; বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় এবং দেব রাক্ষসগণ হইলে, তাহাতে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বা কলহ প্রিয় হইবে, তুমি কি দেখ নাই, যে রাক্ষসগণ যুক্ত পাত্র বা পাত্রীর সহিত নরগণ যুক্ত পাত্র বা পাত্রীর বিবাহ হয় না, হইলে তাহাদের মৃত্যু সুনিশ্চয়।

দরাফ। আজ্ঞা হাঁ ; আমাদের পাড়ায় চিন্তামণির বিবাহের সময়ে শুনিয়াছি বটে ; তাহার রাক্ষসগণ ছিল বলিয়া পাত্রের পিতা বিবাহ দিলেন না। সে বৈশ্যবর্ণ ছিল বলিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে তাহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল।

রামানন্দ। যাহা হউক, তোমার চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই, যখন তুমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছ, তখন আমি তোমাকে তান্ত্রিক মন্ত্র প্রদান করিব, তোমার জননীকে বলিয়া ইহার উপযোগী অনুষ্ঠান কর ; তুমি জন্মদোষদুষ্ট হইয়াছ বলিয়া জননীর প্রতি যেন কখন ভক্তি বিহীন হইও না—ইহা তোমার পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল।

দরাফ। প্রভু! ইহাতে মায়ের প্রতি আর অভক্তি হইবে কেন, মন ত সদাই চঞ্চল—আমার ভাগ্য দোষে হঠাৎ এভাব তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল—বিধাতৃ-বিধানে মানবের হাত কি? এই বলিয়া দরাফ হৃষ্টান্তঃকরণে গৃহগমন করিলেন। তান্ত্রিকমন্ত্র-গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই দেবী সুরধুনী তাহার প্রতি সদয় হইবেন; যে উৎকট আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনোমধ্যে এত দিন জাগরিত প্রাণের চঞ্চলতা বৃদ্ধি করিয়াছিল—রামানন্দ তাহার স্থিরতা সম্পাদন করিবেন—তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষের কৃপা হইলে সকলই সম্ভব। দরাফের আনন্দের সীমা রহিল না।

রাজা রণধীর জ্যোতিষশাস্ত্রে গুরুদেবের অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। এইজন্য তিনি যাবতীয় সাধনার ভার, রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের ভার রামানন্দের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। বেলা মধ্যাহ্নের সমীপবর্ত্তী, রাজা তাঁহার পদধূলি হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দরাফ হাসিতে হাসিতে গৃহে গমন করিলেন রামানন্দও জটেশ্বরের মন্দিরে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার আয়োজন করিতে চলিয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

গুরুকৃপাহি কেবলম্।

দরাফের মতিগতির বিষয় রামানন্দ বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিয়াছেন। তাহার দ্বারা যে ভক্ত-সমাজের মুখোজ্জ্বল হইবে, তাহার প্রাণের একান্ত ঐকান্তিকতা যে একদিন জগদম্বার পাদপদ্মে একান্ত

জড়িত হইয়া সংসার সমুজ্জ্বল করিবে, তাহা তিনি সেই দিনকার ভূতের ঘটনা শুনিয়া এবং তারপর জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনায় বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। দরাফ যে সামান্য বালক নহে—তাহার ভবিষ্যত জীবন যে অতি সুখময়, তাহা তাহার প্রত্যেক কার্য্য কলাপে বেশ প্রতীয়মান হইত; এই জন্য মেহের আলী ও ভুবনেশ্বরী তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। আর ষোড়শীর বিষয়ত আমি জানি—তাহার ত স্বামি-সৌভাগ্য অদৃষ্টের অমোঘ ফল, ভুবনেশ্বরী ত আমার দ্বারা সে বিষয় গণনা করিয়া পূর্ব্ব হইতেই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। আহা! মায়ের আমার এরূপ সৌভাগ্য উদয় না হইলে যে শাস্ত্র মিথ্যা হইবে? দরাফের লক্ষণাদি যেরূপ সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট—তাহা মহাপুরুষেরই উপযুক্ত। এইবার তাহার ডাকে জগদম্বার আসন টলিবে, ভক্ত ভক্তাধীনার দর্শন পাইবে, তাহার মুখোচ্চারিত সুললিত সুরধুনীর-স্তোত্র অতিবড় পাষণ্ডের প্রাণেও ভক্তির সঞ্চার করিবে; পতিতপাবনী মা জাহ্নবী দরাফের হৃদয় নিহিত ভক্তি-প্রাবল্যে উজান বহিবেন বলিয়া আজ এই শুভ সংযোগ আর আমার ন্যায় হীনমতিকে ধন্য করিবার জন্য আজ এই কার্য্যের ভার প্রদান করিলেন। সিদ্ধ সাধক রামানন্দ পরদিন প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া কায়মনঃপ্রাণে মহামায়ার উদ্বোধন করিয়া লইলেন। মাঝি পাকা না হইলে তরণী যেমন বানচাল হইয়া যায়, আরোহী ডুবিয়া মরে, সেইরূপ মানব দেহ-তরণীর কর্ণধার গুরুদেব পাকা না হইলে ভবসমুদ্রে তাহার জীবাত্মার উদ্ধার সাধন অসম্ভব। গুরু নিজ কৃপাবলে সিদ্ধমন্ত্রদানে মানুষকে পাকা না করিলে—তাহার উদ্ধারের উপায় নাই; এই জন্য মন্ত্রগ্রহণে পাকা গুরুর আবশ্যক,

যিনি নিজে উদ্ধার না হইয়াছেন, সাধ্যবস্তুর অন্বেষণে যিনি নিজে পরিপক্ক নহেন—তিনি অপরের ভার কেমন করিয়া লইবেন? এইজন্য শাস্ত্র বলিতেছেন—ভাগ্যক্রমে সিদ্ধ মহাপুরুষ গুরুরূপে প্রাপ্ত হইলে শিষ্যের আর কোন প্রকার ভাবনা থাকে না, নতুবা তাহাকে নিজেই অনেক প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া, জীবন সংগ্রামে নানারূপে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইয়া তবে কূল পাইতে হয়—আর গুরুর শক্তি তাহাতে সংযোজিত হইলে মনোবাসনা সত্বর সফল হইয়া থাকে। দরাফ সৌভাগ্যক্রমে আজ সেই সিদ্ধ মহাপুরুষের কৃপা লাভ করিলেন। তাঁহার পবিত্র বংশ-মর্য্যাদাই এ সময় তাঁহাকে বিবিধরূপে সাহায্য করিতে লাগিল।

কমলা নিজবংশমর্য্যাদাগুণে এসকল কার্য্যে আজীবন অভ্যস্থা, মন্ত্রো-পদেশের অনুষ্ঠান করিতে তাঁহার কোন বাধা ঠেকিল না। কার্য্য অতি গোপনীয় ভাবেই হইতেছে, পাড়ার কেহ এ বিষয় কিছু বুঝিতে পারিল না; মুসলমানের ঘরে পূজা পদ্ধতির ব্যবস্থা কিরূপে হইবে? তারপর সকলে মনে করিল—দরাফের মা ত আর মুসলমান হয় নাই, এ কাজকর্ম্ম বোধ হয় তাঁহারই হইবে। ইহার জন্য আর বড় কেহ কোনপ্রকার প্রতিবাদ করিল না।

বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় রামানন্দ কমলালয়ে আসিয়া গঙ্গা-পূজা করিলেন এবং মতিয়া ও দরাফকে আজ হইতে দেবীর ভক্ত করিবার জন্য যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিতে হয়, তদ্বিষয়ে ত্রুটী হইল না। "গাং গঙ্গে সুর-তরঙ্গিণী" এই মন্ত্র অহরহঃ জপ করিবার নিয়ম প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। গঙ্গাদেবী কোন সিদ্ধ বিদ্যা বা মহাবিদ্যার শ্রেণীভুক্ত নহেন, এই জন্য তাঁহার কোন গায়ত্রী নাই, তান্ত্রিক মতে উপরোক্ত মন্ত্র জপ করিলেই সকল কার্য্য সিদ্ধি হইবে, পতিতপাবনী মা সকলকে

উদ্ধার করিবেন। তারপর দেবীর ধ্যান উভয়কে পাঠ করাইতে লাগিলেন ঃ—

সুরূপাং চারুনেত্রাঞ্চ চন্দ্রাযুতসমপ্রভাম্।
চামরৈর্বীজ্যমানাস্তু শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতাম্॥
সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণার্দ্রনিজান্তরাম্।
সুধাপ্লাবিতভূপৃষ্ঠা মার্দ্রগন্ধানুলেপনাম্॥
ত্রৈলোক্যনমিতাং গঙ্গাং দেবাদিভিরভিষ্টুতাম্।
ধ্যায়েন্মকরপৃষ্ঠস্থাং শ্বেতালঙ্কারভূষিতাম্॥

গঙ্গা ভক্তিতে দরাফের প্রাণ ত বহুদিন হইতেই তন্ময় হইয়া রহিয়াছে, দেবী মাহাত্ম্য তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে, কাজেই ভগবতীর ধ্যান,তাঁহার রূপ বর্ণনা শুনিয়া তাহার হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল, নয়ন হইতে দর বিগলিত ধারে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল ; দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। মতিয়া কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলেন না বলিয়া রামানন্দ বলিতে লাগিলেন—তোমাদের মা গঙ্গাদেবী সুরূপা, সুনয়না এবং অযুত চন্দ্রের ন্যায় প্রভা বিশিষ্টা, সখীগণ তাহাকে শ্বেত-চামর ব্যজন করিতেছে এবং মস্তকে শ্বেত ছত্রধারণ করিয়া আছে। তিনি ভক্তগণের প্রতি সদা প্রসন্ন, অন্তর করুণারসে পরিপূর্ণ, তাঁহার পবিত্র সলিলরূপ সুধাধারে জগত প্লাবিত হইতেছে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দন চর্চ্চিত, তিনি শ্বেতবর্ণের অলঙ্কার পরিধান করিয়া মকরের উপর উপবিষ্টা এই দেবীকে সুরনরগণ পতিতপাবনী বলিয়া সর্ব্বদা ধ্যান করেন।

দেবীর মহিমা বুঝিতে পারিয়া মতিয়ার হৃদয় এইবার আর্দ্র হইল, দেবীর রূপ-প্রভা এবং ভক্তের প্রতি করুণার বিষয় শ্রবণ করিয়া

ছলছল নেত্রে যুক্তকরে মস্তক নত করিলেন। কমলা বহুক্ষণ হইতে ধ্যান-স্তিমিত নেত্র, মুদিত নয়ন হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। ইহার পর রামানন্দ ভগবতী গঙ্গার মাহাত্ম্য বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥

যে ভক্ত শত যোজন অন্তর হইতে গঙ্গা গঙ্গা বলিয়া ডাকে, তাহার সকল পাপ মুক্ত হইয়া যায়, সে সদ্গতি প্রাপ্ত হয়, তাহার জলে অবগাহন করিলে ত আর কথাই নাই—সে সদ্য মুক্তিলাভ করে, এই জন্য প্রণাম করিবার সময় বলিতে হয় :—

সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ ॥

ভক্তিভরে তাঁহার নাম করিবামাত্র সকল পাপ নষ্ট হয়, সকল দুঃখের নাশ হইয়া সাধক সুখস্রোতে ভাসিতে থাকে, মা আমার সুখ-মোক্ষ-দায়িনী এই জন্য গঙ্গাদেবীই জীবের পরম গতিস্বরূপা।

মন্ত্রগ্রহণ হইয়া গেল কিন্তু দরাফের মনে একটী সন্দেহ স্থান পাইল তিনি গুরুর নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন—প্রভু! আমার কিছু কিছু সন্দেহ হইয়াছে।

রামানন্দ—কেন, বৎস! তোমার মনে কি সন্দেহ উপস্থিত হইল, প্রকাশ করিয়া বল।

দরাফ। প্রভু! মাকে শত যোজন অন্তর হইতে ডাকিলেই যদি জীবের উদ্ধার হয়, তবে জগতে এত পাপীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে কেন?

রামানন্দ। বৎস! ডাকার মত ডাকিলেই জীবের উদ্ধার হয়, তোমার ডাক যদি মায়ের কাণে পৌঁছায়, যদি তিনি শুনিতে পান, তবে ত তোমায় কোলে করিবেন, তোমার উদ্ধার হইবে—আর শুনিতে না পাইলে মায়ের দোষ কি? ইহা শুধু তোমার নয়, এ সন্দেহ ভগবতী পার্ব্বতীরও একদিন হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে তোমাকে একটী পৌরাণিক গল্প বলিতেছি শুন:—

সগর বংশাবতংশ ভগীরথ যখন হরিপাদপদ্মসম্ভূতা, ব্রহ্মকমণ্ডলু-বিহারিণী গঙ্গা দেবীকে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত পতিত পিতৃপুরুষগণের উদ্ধার সাধন জন্য মর্ত্ত্যে আনয়ন করিলেন। তখন তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণে সকলে পুলকিত হইয়া উঠিল। কৈলাসে দেবী পার্ব্বতী, তখন মহেশ্বরকে করযোড়ে বলিতে লাগিলেন—প্রভু! গঙ্গা যখন এরূপ মহিমাময়ী, শত যোজন অন্তর হইতে তাঁহাকে ডাকিলে যখন জীবের উদ্ধার সাধিত হয়, তখন ত আর পাপী কেহ থাকিবে না, সকলেই ত মুক্ত হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হইবে, তবে যমরাজের রাজত্বে প্রয়োজন কি; পাপী না হইলে ত আর তাঁর অধিকার ভুক্ত কেহ হইবে না?

ভগবান ভূতনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—দেবি! সে বিষয় তুমি নিশ্চিন্ত থাক, যমের রাজত্ব যেমন চলিতেছে, সেইরূপই চলিবে? কয়জন তেমন আকুলকণ্ঠে ভক্তিপরিপ্লুত হৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিতে পারিবে; জীবের কি তাহাতে মতি থাকিবে। জাহ্নবীর পূত জল স্পর্শ করা পরের কথা, ভক্তিভরে ডাকিলেও উদ্ধার হইবে; কিন্তু তাহা করিবেই বা কে, আর সেরূপ বিশ্বাসই বা হইবে কাহার?

পার্ব্বতী। সে কি প্রভু! এই যে এত লোক মাতর্গঙ্গে, বলিয়া

পবিত্র সলিলে অবগাহন করিতেছে—ইহারা কি কেহই যথার্থ গঙ্গা স্নান করিতেছে না ?

ভগবান বলিলেন—এক লক্ষের মধ্যে বোধ হয় একজনেরও সে ভক্তি নাই ; কেবল নানা জনে নানা অভিপ্রায়ে গঙ্গা স্নানে আসিয়া থাকে, কেহ বা স্রোতজলে স্নান করিলে শরীর ভাল হইবে বলিয়া আসে, কেহ স্নানার্থিনী রমণীগণের দর্শন অভিলাষে আসে ; কেহ প্রাতভ্র্মণের জন্য আসে কিন্তু স্নানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ে পোষণ করিয়া কেহই আসে না—যদিও আসে সে অতি বিরল—লক্ষের মধ্যে একটীও হয় কিনা সন্দেহ।

ভগবতী কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বলিলেন—প্রভু! তাহাও কি সম্ভব, ঐ দেখুন আজ সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে কতশত নরনারী স্নান করিতেছে, উহার কেহই কি উদ্ধার হইবে না ?

মহাদেব বলিলেন—পার্ব্বতি ! তোমার বিশ্বাস হইতেছে না, আচ্ছা, চল, মর্ত্ত্যে যাইয়া তোমার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া ভগবান শবরূপে পড়িয়া রহিলেন আর পার্ব্বতীকে বলিয়া দিলেন তুমি ক্রন্দন কর, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে আমার পতির মৃত্যু হইয়াছে, লোকাভাবে দাহ করিতে পারিতেছি না, দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া যদি কেহ এই কার্য্যে ব্রতী হইতে আসে, তাহা হইলে বলিবে যথার্থ গঙ্গাস্নান না করিয়া এই দেহ স্পর্শ করিলে—তাহার মৃত্যু হইবে ; যথার্থ গঙ্গা স্নান করিয়া ইহা স্পর্শ করুন।

তাহাই হইল—আজ সূর্য্য গ্রহণ উপলক্ষে লক্ষলক্ষ নরনারী গঙ্গাস্নানে সমাগত ; ঘাটের সন্নিকটে একটী অসূর্য্যম্পশ্যরূপা কামিনীকে শবদেহ কোলে করিয়া কাঁদিতে দেখিয়া সকলেই নিকটে আসিল

এবং কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কামিনী কারণ ব্যক্ত করিলেন, সকলেই রাজী হয় কিন্তু যথার্থ গঙ্গাস্নান না করিয়া শবদেহ স্পর্শ করিলে মৃত্যু হইবে শুনিয়া আর কেহ অগ্রসর হইল না, সকলেই টিট্‌কারী দিয়া দূরে পলায়ন করিল। বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত, ঘাটে আর তত লোকজন নাই; লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করিয়া গেল, কিন্তু কেহ শবদেহ স্পর্শ করিবার ভরসা করিতে পারিল না, যথার্থ গঙ্গাস্নান করিয়াছে বলিয়া হৃদয়ে দৃঢ়তা কাহারও হইল না। রমণীর উপকারার্থে আর কেহই অগ্রসর হয় না দেখিয়া ভগবতী আশ্চর্য্য হইলেন, মনে মনে বলিলেন—ওঃ মর্ত্ত্যের নরনারী কি অধঃপাতেই গিয়াছে; আমি প্রভুকে যমের রাজত্ব তুলিয়া দিতে বলিতেছিলাম—এখন দেখিতেছি আরও একটী যমরাজ্য সৃষ্টি করিলে ভাল হয়,—মানুষ যেরূপ অবাধে পাপের পথে অগ্রসর হইতেছে, পাপীর সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে একাকী কৃতান্ত কি করিতে পারিবেন। এই বলিয়া মনে মনে সংক্ষুব্ধ হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিবার চেষ্টা করিতেছেন—প্রাতঃকাল হইতে দ্বিতীয় প্রহর অবধি এত লোকের মধ্যে যখন কেহই সাহস করিল না, তখন আর কেন, আমার বৃথা সন্দেহ বিদূরিত হইয়াছে—এই বলিয়া তাঁহারা যখন স্বস্থানে যাইবার জন্য বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন—ঠিক সেই সময়ে একটা বিষম সুরাপায়ী, অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায়, ধূলিধূসরিত দেহে ঘাটে আসিয়া প্রথমেই শবদেহ ক্রোড়ে কামিনীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এ বেটী! কাঁদছিস কেন, কি হয়েছে?

কামিনী সলজ্জে উত্তর করিলেন—বাবা! আমি অনাথিনী, পতি-বিয়োগ হইয়াছে—ইহাঁর দাহ করিবার লোক খুঁজিয়া পাইতেছি না।

মাতাল। দাহ, সৎকার, আচ্ছা আমি কচ্চি, চ।

কামিনী। বাবা, যথার্থ গঙ্গাস্নান না করিয়া যে এই দেহ স্পর্শ করিবে, তাহার মৃত্যু হইবে—এইরূপ কোষ্ঠীর লিখন।

মাতাল। হাঁ, এতবড় কথা, আচ্ছা, তবে দাঁড়া আমি গঙ্গা নেয়ে আসি। এই বলিয়া মাতাল প্রগাঢ় ভক্তিভরে তরঙ্গিণী তটবর্ত্তী হইল এবং মাগো পতিত পাবনী, এই পতিতকে পবিত্র কর মা, উদ্ধার কর মা, বলিয়া দুই তিন ডুব দিয়া রমণীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভগবান মহাদেব তখন উঠিয়া বলিলেন—পার্ব্বতি! এত লোকের মধ্যে এই একজন লোক গঙ্গাস্নান করিয়াছে; এই নিষ্পাপ হইয়াছে, ইহারই উদ্ধার সাধিত হইয়াছে। এ মাতাল বেশ্যাশক্ত এবং নানাবিধ কুকর্ম্মান্বিত হইলেও হৃদয়ে ইহার সদাই ভক্তির বাণ ডাকিয়া দুকুল পবিত্র করিতেছে, এইরূপ পতিতকেই পতিতপাবনী গঙ্গা উদ্ধার করেন, নতুবা জীবন্মুক্তি কি সহজসাধ্য; কত জন্ম জন্মান্তরের সাধনা থাকিলে তবে হৃদয় এরূপ ভক্তিরসাশ্রিত হয়? জগা-মাতালকে প্রত্যহ লোকে এইরূপ মত্তাবস্থায় গঙ্গাস্নান করিতে দেখিত; এই ঘটনার পর হইতে আর জগা গঙ্গাস্নানে আসে নাই। পাঠক বলিতে পারেন কি, মাতাল কোথায় গেল?

গঙ্গাভক্ত দরাফখাঁ মাতালের গল্প শুনিয়া, তাহার গঙ্গাভক্তি বলে জীবন্মুক্তির বিষয় শ্রবণ করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। যে ভক্তি বিশ্বাসের প্রবল স্রোত তাহার হৃদয়-কন্দরে ফল্গুর লুপ্তস্রোতের ন্যায় অন্তঃসলিলে বহিতেছিল, আজ তাহা ব্যক্ত হইয়া পড়িল। নদী বাঁধ ভাঙ্গিলে যেমন উছলিয়া প্রবাহিত হয়;

কোন বাধা মানে না, দয়াক-হৃদয়ের ভক্তির স্রোত লোক-গঞ্জনার বাধা অতিক্রম করিয়া প্রবলবেগে বহিতে লাগিল, তাহার হৃদয়ের কপাট খুলিয়া গেল ; বাল্যে যে অল্প মাত্র সংস্কৃত শুনিয়া শুনিয়া শিখিয়াছিল, সে আজ ভক্তির উচ্ছ্বাসে, প্রাণের আবেগে করযোড়ে সংস্কৃতভাষায় দেবীস্তব করিতে লাগিল :—

যত্ত্যক্তং জননীগণৈর্যদপি ন স্পৃষ্টং সুহৃদ্বান্ধবৈ
র্যস্মিন্ পান্থ দৃগন্ত-সন্নিপতিতৈ র্যৈঃ স্মর্য্যতে শ্রীহরিঃ।
স্বাঙ্কে স্কন্ত তদীদৃশং বপুরহো সুপ্রীয়সে পৌরুষং
ত্বং তাবৎ করুণা-পরায়ণপরা মাতাসি ভাগীরথি !
অচ্যুত-চরণ-তরঙ্গিণী, শশি-শেখর-মৌলী-মালতী মালে।
ত্বয়ি তনু-বিতরণ সময়ে, হরতা দেয়া ন মে হরিতা ॥
শূন্যীভূতা শমননগরী—নীরবা রৌরবাদ্যা
যাতায়াতৈঃ প্রতিদিন-মহো ভিদ্যমানা বিমানাঃ।
সিদ্ধৈঃ সার্দ্ধং দিবি দিবিষদঃ সাক্ষপাত্রৈকহস্তা
মাতর্গঙ্গে যদবধি তব প্রাদুরাসীৎ প্রবাহঃ ॥
পয়োহি গাঙ্গং ত্যজতামিহাঙ্গং, পুনর্নচাঙ্গং যদি বৈত্তিচাঙ্গং
করে রথাঙ্গং শয়নে ভুজঙ্গং, যানে বিহঙ্গং চরণে চ গাঙ্গং ॥
কত্যক্ষীণি করোটয়ঃ কতি কতিদ্বীপি—দ্বিপানাং ত্বচঃ
কাকোলাঃ কতি পন্নগাঃ কতি সুধা ধাম্নশ্চ খণ্ডাঃ কতি।
কিঞ্চ ত্বঞ্চ কতি ত্রিলোকজননী ত্বদ্বারিপুরোদরে
মজ্জজ্জন্ত-কদম্বকং সমুদয়ত্যেকৈক মাদায়-যৎ ॥
কুতোঽবীচির্বীচিস্তব যদি গতালোচন পথং
ত্বমা পীতা পীতাম্বর পুরনিবাসং বিতরসি।

স্বত্বৎসঙ্গে গঙ্গে যদি পততি কায়স্তনুভৃতাং
তদা মাতঃ শাতক্রতব-পদলাভোঽপ্যাতি লঘুঃ ॥
ত্বমন্তো লোকানা-মখিলদুরিতান্যেব দহসি
প্রগল্ভা নিম্নানামপি, নয়সি সর্ব্বোপরিনতান্ ।
স্বয়ংজাতা বিষ্ণোর্জ্জনয়সি মুরারাতি নিবহা—
নহো মাতর্গঙ্গে কিমিহ চরিতংতে বিজয়তে ॥ *

এইবার বাষ্পাকুলিত নেত্রে যুক্ত করে উচ্চৈঃস্বরে ব্রহ্মকটাহ ভেদ করিয়া পাগলের স্থায় বলিতে লাগিলেন :—

স্বরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
স তরতি নিজ পুণ্যৈস্তত্র-কিন্তে মহত্বং ।
যদি চ গতি বিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
তদিহ তব মহত্বং তন্মহত্বং মহত্বং ॥

দেবী ভাগীরথি! পুণ্যবান্‌কে উদ্ধার করিলে তোমার মহত্ব কোথায় মা, সে ত নিজের সাধন বলেই উদ্ধার হইবে—তাহাতে তোমার কৃতিত্ব—তোমার মহত্ব কিছুই নাই ; সে ত নিজ পুণ্যবলে তোমার তীরে দেহ পাত করিয়া বিষ্ণুলোকে চলিয়া যাইবে—মুক্ত হইয়া ভগবৎ পাদপদ্ম লাভ করিবে। তাকে মুক্তি দেওয়ায় তোমার বাহাদুরী কি মা! যদি তুমি আমার স্থায় এই মহাপাপী দুরাচারকে, মুক্তি দিতে পার, যদি আমার দুষ্কৃতি দুর করিয়া আদর করিয়া গর্ভধারিণীর মত কোলে লইতে পার তবেই তোমার সেই মহত্বকে প্রকৃত মহত্ব বলিয়া জানিব—এই বলিয়া দরাফ চৈতন্যময়ীর চৈতন্তে বাহ্যিক

* কেহ কেহ বলেন—এই স্তব বেদব্যাসের কৃত, দরাফ খাঁ হৃদয় নিহিত ভক্তি-প্রাবল্যে পাঠ করিতেন মাত্র।

চৈতন্যহীন হইয়া ভাবাবেশে ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। মতিয়া স্বামীর অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। রামানন্দ বলিলেন—মা! স্থির হও, তোমার স্বামীর কি আর মৃত্যুভয় আছে, যে তাহার জন্য কাঁদিতেছ; মৃত্যু ইহার নিকট ভয় পাইয়া আজ হইতে দূরে পলায়ন করিল। এই বলিয়া "মাতর্গঙ্গে পতিতপাবনি" নাম দরাফের কর্ণকূহরে উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দরাফের চৈতন্য সঞ্চার হইল। মাতৃ উপদেশ গ্রহণে দরাফের অবস্থা দেখিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রণধীর দ্বারবাসিনীতে আসিতে-ছিলেন—ত্রিবেণীর নিকট আসিয়া দেখিলেন—গঙ্গা উজান বহিতেছেন, যেন প্রবল বাণ আসিয়াছে, দেবী যেন মহানন্দে নৃত্য করিতেছেন। রণধীর ঠিক সেই সময়ে দরাফের বাটীতে আসিয়া দেখিলেন—ভক্তবীর দরাফ—মুসলমান-সাধকশ্রেষ্ঠ দরাফ খাঁ। ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে দেবীস্তোত্র পাঠ করিয়া বাহ্যিক সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছে। সাধক রামানন্দ প্রেমাশ্রুনীরে বুক ভাসাইয়া বলিতেছেন—আজ আমিও সাধকশ্রেষ্ঠ দরাফের মন্ত্র-গুরু হইয়া নিজেকে ধন্যজ্ঞান করিলাম। রাজা রণধীর ভাববিহ্বল হইয়া বলিলেন—আজ ত্রিবেণী গ্রাম পার্শ্বস্থ সকল গ্রামের পবিত্রতা সাধন করিয়া এমন ভক্তবীরের পদার্পণে ধন্য হইল; ধন্য ভক্ত-বীর; তোমার জন্ম সার্থক, তোমার কর্ম্ম সার্থক; তোমার জননী রত্নগর্ভা, তোমার বংশ পবিত্র এবং এক্ষণে যে ধর্ম্মে যে বংশে তুমি অবস্থান করিতেছ—সেই স্বর্গীয় মেহের আলী ও আমিনার বংশও ধন্য হইল। এমন পতির পত্নী হইতে পারিয়াছে বলিয়া মতিয়াও

আবেগ ভরে স্বামীর পদধূলি নিজ মস্তকে লইয়া ধন্য হইল। আজ দ্বারবাসিনী গ্রামে বিশ্বজননীর অসীম লীলা খেলার মধ্যে ভক্তি-মার্গের একটী প্রাণারাম দৃশ্যপট লোকের চক্ষু ধাঁধিয়া সুসম্পন্ন হইয়া গেল। প্রতিবাসী সকলে অবাক হইয়া এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনান্তে পতিতপাবনীর জয় নিনাদে গগনতল প্রকম্পিত করিল। কমলা এইবার পা মেলিয়া বসিয়া সাধক চূড়ামণি পুত্রকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। রামানন্দ সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজার সহিত মহানাদে চলিয়া গেলেন। ভক্তগৃহে এইবার অতিথি সৎকার আরম্ভ হইল। সওদাগর তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। গঙ্গাদেবীর প্রধান ভক্ত বলিয়া আজ হইতে দরাফ খাঁর নাম চারিদিকে বিস্তৃতি লাভ করিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সাধনার প্রভাব।

রাজা রণধীর এখন দরাফের বড়ই পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি যে একজন ভক্তিমান সাধক—মুসলমান হইলেও যে তিনি হিন্দুর আরাধ্য, রণধীরের প্রতীতি হওয়ায় তিনি গুরুদেবের আদেশে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। দরাফ বড় ফুল ভাল বাসিতেন, এইজন্য রাজা তাঁহার বাটীর নিকট একটী পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। দরাফ তাহার] মধ্যে ফকিরবেশে

পতিতপাবনী গঙ্গাদেবীর উপাসনা করিতেন। দরাফের চিত্ত অনেকাংশে সংযত হইয়াছে বটে কিন্তু প্রবৃত্তি তাহাকে এখনও সময়ে সময়ে নাড়াচাড়া দেয়। রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন —বৎস! প্রবৃত্তি যখন বলবতী হইবে—তখন ঈশ্বরমুখী করিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিও—তাহা হইলে ক্রমশঃ তাহা দমিত হইয়া যাইবে। তন্ত্রে এই জন্য পঞ্চতত্ত্বের সাধন-প্রথা প্রচলিত আছে, যাহার প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল কিছুতেই তাহার হাত এড়াইতে না পারিলে মাতৃনামে ঐ সমস্ত উৎসর্গীকৃত করিয়া ভোজন কর, দেখিবে ক্রমশঃ প্রবৃত্তির ক্ষমতা কমিয়া নিবৃত্তির লক্ষণ প্রকাশিত হইবে। ঐ নিবৃত্তিই যথার্থ নিবৃত্তি নতুবা লোক দেখান নিবৃত্তি করিলে, নিরম্বু উপবাস করিয়া স্নানের সময় ডুবিয়া জল খাইলে তোমার লোকের নিকট প্রতিপত্তি লাভ হইবে বটে কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি করিয়া তুমি সাধন পথে আর অগ্রসর হইয়া ইষ্টসিদ্ধি করিতে পারিবে না। মা আমার অন্তর্যামিনী, লুকাইয়া তাঁহার নিকট পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। অতএব যখন যে বিষয় বাধা ঠেকিবে—কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিয়া দিবেন, ভক্ত বৎসলার নিকট ভক্তের প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে না। তোমাকে মায়ের ধ্যান মন্ত্র প্রদান করিয়াছি; মন ভক্তিরসে আর্দ্র করিয়া ঐ ধ্যানমূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই তুমি অচিরে মাতৃদর্শন লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারিবে। আত্মতত্ত্বের সহিত বিদ্যা ও শিবতত্ত্ব সংযোগ করাই সাধনা—এই সাধনায় সুসিদ্ধ হইতে পারিলে মা তোমার অন্তরে-বাহিরে বিরাজ করিবেন, মা কখন আমাদের ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না, তিনি আমাদের কাছে

কাছে এই হৃদয়ের মাঝে সতত বিরাজ করিতেছেন, আমরা দেখিনা—দেখিতে চাহিনা বলিয়াই—যা তা দেখিয়া আমাদের দর্শন সাধ মিটে না—অসার বস্তু দেখিয়া, তাহার অসারত্ব ভোগ করিয়া কেবল আজীবন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি; সুশীতল জলাশয় ভ্রমে মায়া মরিচীকায় পড়িয়া প্রাণ হারাইতেছি। বাজীকরের মেয়ে লীলা-খেলা করিবার জন্য আমাদের অন্তরের অন্তরালে লুকাইয়া আমাদের লইয়া কত খেলা করিতেছেন; জন্ম মরণের কত বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখাইয়া আমাদের নয়ন বাঁধিয়া রাখিয়াছেন—আমরা সেই অসার দৃশ্য দেখিয়া—তাহার চাকচিক্যে ভুলিয়া ইহপরকাল নষ্ট করিতেছি। আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি—আসিবার উদ্দেশ্য কি, এবং ইহার পর কোথায়ই বা যাইতে হইবে—তাহার চিন্তা একবারও করি না; কিন্তু যে এ সকল কিছুই চায় না—যাহার মায়ার আবরণ কাটিয়াছে;—মা তাহাকে আর ফাঁকি দিতে পারেন না—কারসাজী করিয়া তাহার নিকট আত্মগোপন করিবার শক্তি আর তাঁর থাকে না, অশান্ত পুত্রের নিকট মায়ের চাতুরী কতদিন চলে, ভক্তের নিকট ভক্তাধীনার অদেয় কি আছে? তাই বলি—বৎস! রত্ন পাইবার জন্য তোমাকে আর কোথাও খুঁজিতে হইবে না। তোমার হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে সকল রত্নের সার রত্ন ছড়ান রহিয়াছে, তুমি ভক্তি-বিশ্বাসের জাল ফেলিয়া ঐ রত্ন সংগ্রহ করিতে পারিলেই—আশা মিটিবে, তৃষা ছুটিবে—অসার রত্ন লাভের লালসা তোমার চিরতরে নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। সরাফ গুরু-দেবের অমোঘ উপদেশবাণী হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া লইলেন।

রামানন্দ অনেকদিন দেশত্যাগী হইয়াছেন। তাঁহার নিকট শিষ্যগণ

দেশে যাইবার জন্য ক্রমশঃ সংবাদ পাঠাইতেছেন, কাজেই আর না যাইলে নয়। রামানন্দ রণধীরকে ত্রিবেণীতীরে দরাফের জন্য একটী আস্তানা প্রস্তুতের পরামর্শ দিয়া অমৃতসহর গমন করিলেন। যাইবার সময় কমলাকে বলিয়া গেলেন—আর আমার দর্শন পাইবে না; পুত্র তোমার সাধন পথে যেরূপ অগ্রসর হইয়াছে, ভক্তি-বিশ্বাসে তাহার হৃদয় যেরূপ দৃঢ় হইয়াছে, তাহাতে উহার আর পতন হইবার সম্ভাবনা নাই; তুমি তাহারই আশ্রয়ে জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিয়া অন্তে পতিতপাবনী সুরধুনী-তীরে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়া কৈবল্য প্রাপ্ত হইবে।

গুরুদেব চলিয়া গেলেন। দরাফ খাঁ কিছুদিন পুনরায় তীর্থ-ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে রাজা রণধীর বলিলেন—ইচ্ছা হয় যাও, তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু আমি তোমার জন্য ত্রিবেণী তীরে আস্তানা প্রস্তুত করিতেছি; তাহা যেন ব্যর্থ না হয়।

দরাফ বলিলেন—মহারাজ! কোন চিন্তা করিবেন না—আমি ত্রিবেণীর মাতৃক্রোড় ছাড়িয়া কোথাও থাকিব না—তবে মাতৃ-আদেশে আমি কিছুদিন তীর্থ-ভ্রমণ করিলে স্থান মাহাত্ম্যে আমার চিত্ত শুদ্ধিও হইতে পারিবে—এখন সময়ে সময়ে আমি যেরূপ বিভ্রান্ত হইয়া পড়ি, এ স্থান হইতে অবসর গ্রহণ করিলে আর সে ভাব হৃদয়ে জাগরিত হইতে পারিবে না। সাধন-বিষয়ে মনই হইল—সব, তাহাকে প্রকৃত স্ববশে আনিতে না পারিলে কিছুই হইবে না—এই জন্য কয়েক মাসের জন্য যাইতেছি; ততদিন আপনার প্রদত্ত আস্তানা প্রস্তুত হইয়া যাইবে—আমি আসিয়া এইবার তথায় চিরতরে আবদ্ধ হইব। আর কোথাও যাইব না। গুরুদেব আপনার উপর আমার

সমস্ত ভার অর্পণ করিয়াছেন—আপনিই সমস্ত দেখিবেন। দরাফ বিষয়-বৈভবের মায়া করিলেন না—মাতা, পুত্র,প্রণয়-প্রতিমা মতিয়ার প্রণয়-শৃঙ্খল তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। প্রবল বৈরাগ্যোদয়ে রাজা শাক্যসিংহ যেমন অবহেলায় রাজ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া, গোপার প্রণয় শিকল কাটিয়া, নবপ্রসূত রাজ-পুত্রের স্নেহ মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া দেশের উপকারের জন্য,দশের কল্যাণ সাধন প্রত্যাশায় আত্মোন্নতি করিতে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, দরাফও তদ্রূপ সমস্ত মায়া পাশ ছেদন করিয়া ফকীর বেশে দেশ-ত্যাগ করিলেন; কর্ম্মকঠোর সংসারের কোন বন্ধনই আর তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। তীব্র বৈরাগ্যের নিকট এ সকল বন্ধন যে অতি তুচ্ছ—সহজেই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। যে পুত্রস্নেহে তিনি মুগ্ধ হইয়া একদিনের জন্যও কোথাও রাত্রি যাপন করিতে পারিতেন না, যে পত্নী-প্রেম তাঁহাকে এত দিন উন্মত্ত করিয়া সংসার আলয়ে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, এতদিন যে জননীর আরাধ্য চরণ লাভ করিয়া তিনি জীবন ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন—আজ এ সকল দরাফের বৈরাগ্য-পথের কণ্টক হইল না—তিনি অবহেলায় সে সকল ত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গমন করিলেন। মা যাহাকে আপন কোলে টানিয়া লন, যাহার জীবন পথ এরূপ সুগম করিয়া দিবার ইচ্ছা তাঁহার থাকে তাহার চিত্ত এইরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। মতিয়া ও কমলা দরাফের জীবন্মুক্তির পথে কোনও প্রকার হন্তারক হইলেন না বরং আপনাদিগকে সৌভাগ্যবতী মনে করিতে লাগিলেন। কোন্ সতী-স্ত্রী স্বামীর উন্নতির পথে বাধা দেয়—সহধর্ম্মিণী হইয়া কে কবে পতির ধর্ম্মজীবনে কণ্টক নিক্ষেপ করিয়াছে? মতিয়া স্বামি-গতপ্রাণা হইলেও কোন কথা

বলিলেন না, কেবল প্রার্থনা করিলেন—অন্তিমে যেন দাসী চরণ দর্শনে বঞ্চিত না হয়; তুমি দেবতা—আমায় এই বর প্রদান করিয়া যথা ইচ্ছা গমন কর। কেবল কাম—কামনা চরিতার্থ করিবার জন্যত দরাফ ও মতিয়ার মিলন হয় নাই; এ মিলন যে ধর্ম্মভাবে বিজড়িত; কাম-গন্ধ ইহাতে থাকিবে কেন? কমলাও নয়নজলে অভিষেক করতঃ প্রিয় পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। দরাফ হাসিতে হাসিতে সকলকে অভিবাদন করিলেন; দেশ মাতৃকার পবিত্র রেণু মস্তকে প্রদান করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। পূর্ব্বের ভ্রমণে মায়ার আকর্ষণ ছিল—এবার আর তাহা রহিল না। বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন দরাফ যথার্থ বীরের ন্যায় কর্ম্মময় সংসারে জীবনের সার কর্ম্ম সম্পাদনে বাহির হইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসীর দল।

তারপর প্রায় দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই যুগান্তরে হুগলী জেলার কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। রাজা রণধীর ত্রিবেণীর ঘাটে আস্তানা নির্ম্মাণ করিয়া দরাফের জন্য কতদিন অপেক্ষা করিলেন কিন্তু দরাফ ত কই ফিরিল না। যে

তীব্র বৈরাগ্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া সে দেশত্যাগ করিয়াছে, তাহাতে যে সে আর ফিরিবে এমন আশা করা যায় না, এইরূপ মনে করিয়া হতাশ হৃদয়ে বৃদ্ধ রণধীর ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। সওদাগরও আর নাই, সে দরাফকে বহু যত্নে প্রতিপালন করিয়াছিল; শীঘ্র সে ফিরিয়া আসিবে, আবার তাহার সেই ভালবাসা মাখান সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া সওদাগর আনন্দসাগরে ভাসিবে—কিন্তু তাহা হইল কই? কাল কি তাহার সে আশা পূর্ণ করিবার জন্য এতদিন অপেক্ষা করিবে? সে যে কাহারও আশা আকাঙ্ক্ষা, আদর-ভালবাসা পূরণের অপেক্ষা করে না, সময় হইলেই যে সে তীক্ষ্ণ দন্তে সকলের অস্থি-মজ্জা চর্ব্বণ করিয়া উদরস্থ করিয়া ফেলে। কালের সময় অসময় নাই দিন ফুরাইলে সে নিজ অঙ্কে সমস্ত টানিয়া লইয়া জগতের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দিবে। দুরন্ত কালের এই একটানা স্রোতে পড়িয়া ত্রিবেণী ও তৎসন্নিহিত গ্রামেরও ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কোথাও প্রান্তর পড়িয়াছিল, তাহাতে এখন কত লোকের আবাসভূমি হইয়াছে, আবার যথায় লোকালয় ছিল—তাহা প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে। দ্বারবাসিনী গ্রামে দরাফের সংসারের অবস্থাও তদ্রূপ; গৃহাদি সমস্ত পড়িয়া গিয়াছে। সে নয়নমনোহর সুদৃশ্য গোলাবাড়ী আর নাই, সে সুরম্য পুষ্পোদ্যানে আগাছা জন্মিয়া সমস্ত জঙ্গলময় করিয়া ফেলিয়াছে; তাঁহার ভগ্ন-পতিত গৃহমধ্যে কেবল এক প্রৌঢ়া ও একটি বৃদ্ধ সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তি একটী চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালককে লইয়া অতি কষ্টে বাস করে; তথাপি তাঁহাদের হৃদয়ের প্রফুল্লতা, দেহের সৌন্দর্য্য যেন অতি বড় ভোগ-বিলাসী সুখী ব্যক্তিকেও পরাস্ত করিয়াছে, এত কষ্টেও তাঁহাদের দেখিলে যেন আনন্দ প্রতিমা ভিন্ন আর কিছুই অনুমান হয়

না। ইহাঁরাই আমাদের সাধকপ্রবর দরাফ খাঁর মাতা ও পত্নী আর বালকটী দরাফের পুত্র, এখন বড় হইয়া মাতা ও পিতামহীর আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে।

ত্রিবেণীর ঘাটে সেই অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে এখন কতকগুলি হিন্দু সন্ন্যাসী আসিয়া ধুনি জ্বালিয়াছেন, আজ বহুদিন হইল তাঁহারা এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন; তীর্থযাত্রী নরনারীগণ তাঁহাদের দর্শন করিয়া থাকেন এবং যাঁহার যেমন ক্ষমতা সেইরূপ প্রণামী প্রদান করিয়া যান, ইহাতে সন্ন্যাসিদলের দিন যাপন একপ্রকার মন্দ হয় না। বাঙ্গালাদেশে হিন্দু ও মুসলমানের নিকট সন্ন্যাসী ফকীরের আদর বড় বেশী, তুমি সাধুই হও আর ভণ্ডই হও, এই পন্থা অবলম্বন করিলে তুমি কখন অনাহারে মারা যাইবে না, দেশের লোকের মতি গতি তোমার প্রতি ন্যস্ত হইবেই হইবে— তবে প্রকৃত হইলে তাহা স্থায়ী হইয়া তোমাকে দেবতার আসন প্রদান করে, দেব-ভাবে পূজা করিয়া তোমার মাহাত্ম্য প্রচার করে, আর ভণ্ড হইলে তাহা বেশী দিন থাকে না, অসত্য প্রচার হইয়া তোমার প্রতি ক্রমশঃ লোকের শ্রদ্ধা কমিয়া যায়। ত্রিবেণীস্থ হিন্দু সন্ন্যাসিদলের মধ্যে সকলেই যে ভণ্ড ছিলেন তাহা নহে; দুই একজন জ্ঞানী কর্ম্মী এবং কতকটা উন্নতও ছিলেন; অনেক সহজ-সাধ্য বিভূতি লাভ করিয়া তাঁহারা সাধারণের বেশ চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলেই গঙ্গাভক্ত—ভীষ্মজননী মা ভাগীরথীর তপস্যায় ইহাঁরা সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন। প্রত্যহ স্নানের পর আর্দ্র কৌপিন গুলি নিরবলম্বনে শূন্যে শুষ্ক করিতে দিতেন; কোন প্রকার অবলম্বনের আবশ্যক

হইত না—ইহা দেখিয়া সকলেই চমকিত হইয়া ঐ সন্ন্যাসিদলের সিদ্ধি সম্বন্ধে বিশেষ আস্থা স্থাপন করিয়াছিল। যাহারা স্নানে আসিত, তাহারাই ঐ সন্ন্যাসী সকলের পদধূলি লইয়া পবিত্র হইত, আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিত। কমলাও সময়ে সময়ে তীর্থ স্নানে আসিতেন, ঐ সন্ন্যাসীদের নিকট বসিতেন, তাঁহার প্রাণের পুত্র ঐ দলভুক্ত হইয়া আছেন কি না দেখিতেন কিন্তু তাঁহাদের হাবভাব দেখিয়া কমলার তত ভক্তি হইত না।

তাঁহারা যে খুব সিদ্ধ সাধক, মা: গঙ্গার একান্ত ভক্ত—তাহা তাঁহার বোধ হইত না, তবে কতকটা অগ্রগামী বটে, একেবারে ঝুঠা নহে। কমলা প্রত্যহ ত্রিবেণীতটে আসিতেন, মায়ের পূজা করিতেন, তাঁহার প্রাণের পুত্রকে ফিরিয়া পাইবার জন্য মায়ের জলে কত চক্ষের জল ফেলিতেন। মাতার আন্তরিক ক্রন্দন বিশ্বমাতার নিকট বিফল হইল না।

একদিন সন্ধ্যার প্রাকালে একটী মুসলমান ফকীর ত্রিবেণী তট সন্নিহিত নিম্বরৃক্ষ-মূলে, রণধীর-প্রদত্ত আস্তানার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তখন দিবাবসানে সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিয়াছে, হিন্দু সন্ন্যাসিগণ অপরদিকে সন্ধ্যার পূর্ব্বে কেহ সিদ্ধি, কেহ গঞ্জিকা সেবনে ব্যস্ত, এমন সময় ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া তাঁহাদের শূন্যে অবস্থিত বস্ত্রগুলি পড়িয়া যাইতে লাগিল; যাহা না তুলিলে কখন পড়ে না—আজ তাহা আপনাপনিই পড়িয়া যাইতে লাগিল দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে প্রধান সাধু একটু ভীত হইলেন, হঠাৎ কোন সত্ত্বগুণাবলম্বী মহাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া চারিদিক অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে এইবার তাঁহার

দৃষ্টি ঐ নিম্ববৃক্ষমূলস্থ ফকীরের প্রতি প্রাকৃষ্ট হইল। তখন স্বস্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অতি বিনীতভাবে ফকীরের নিকট আসিয়া বলিলেন—মহাশয় কে আপনি এবং কোথা হইতে শুভাগমন করিয়াছেন ?

ফকীর। আমি অতি সামান্য ব্যক্তি, আমার পরিচয় অনাবশ্যক।

সন্ন্যাসী। পরিচয় না দেন, তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু আপনি অচিরে এইস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান; আমরা এখানে আশ্রম করিয়া বসিয়া আছি; মুসলমান ফকীর এখানে থাকিলে আমাদের তপস্যার ক্ষতি হইতে পারে।

ফকীর নম্রভাবে বলিলেন—মহাশয়! আমার দ্বারা আপনাদের কোন ক্ষতি হইবে না, কারণ আমি কাহার নিকট কিছু প্রত্যাশা করি না। স্থানটী অতিরমণীয় দেখিয়া আমার এস্থানে অবস্থানের অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে, বিশেষতঃ এখানের সহিত আমি চিরপরিচিত, আমার বাল্যযৌবন এখানেই সমাহিত হইয়াছে এবং এই আশ্রম আমার জন্যই নির্ম্মিত, এস্থানে আমি আমার শেষ জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য আসিয়াছি। আমি ত স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিব না।

সন্ন্যাসী। আমাদের ক্ষতি করাই কি আপনার উদ্দেশ্য ?

ফকীর। আমার দ্বারা কখন কাহার ক্ষতি হয় নাই, হইবেও না, তবে একান্ত যদি তাহা মনে করেন, তাহা হইলে আপনারাই ন হয় স্থানটী পরিত্যাগ করুন।

সন্ন্যাসী। আমরা সঙ্কল্প করিয়া আশ্রম করিয়াছি, মনোবাঞ্ছ

পূর্ণ না হইলে কোথাও যাইব না,—এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত পণ করিয়া আমরা ঐ সকল সিদ্ধি করিব।

ফকীর। যদি বাধা না থাকে, আপনাদের মনোগত ইচ্ছা বলুন। সন্ন্যাসী কোন কথা না বলিয়া নীরবে স্থান ত্যাগ করিলেন।

হিন্দু সন্ন্যাসিগণ বহু দিন হইতে এই স্থানে আশ্রম স্থাপন করিয়া পতিতপাবনী গঙ্গার উপাসনা করিতে ছিলেন; তপস্যা করিয়া মা গঙ্গার সাক্ষাৎকার লাভ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। মুসলমান ফকীরের নিকট এখন গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করা অন্যায়, বিশেষতঃ হিন্দুমুসলমানে সাধনা সম্বন্ধে বিশেষ অনৈক্য আছে; তাহারা হিন্দু দেব দেবীর মাহাত্ম্য আদৌ জানে না। এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করত তিনি সে দিন কোন কথা প্রকাশ না করিয়া চলিয়া যাইলেন। কিন্তু মনে মনে মুসলমান ফকীরের উপর তাঁহার একটা দারুণ ঘৃণার ভাব উদ্রেক হইল। সাধন মার্গে অপরিপক্কতা হেতু তাঁহার মন এখনও পার্থিব সংস্পর্শ শূন্য হইতে পারে নাই। আমি হিন্দু—উনি মুসলমান, আমি বড়,—ইনি ছোট, এইরূপ অহংভাবে এখনও তাঁহার হৃদয় কলুষিত, কাজেই সমুন্নত সাত্ত্বিক প্রকৃতি ফকীরের প্রতি তাঁহার দারুণ বিদ্বেষ ভাব বদ্ধমূল না হইবে কেন? এলোক এখানে থাকিলে, তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ প্রকাশ পাইলে, নিশ্চয়ই যে তাহাদের ক্ষতি হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই কিন্তু ফকীরের হৃদয়ে সে ভাব নাই, উন্নতচেতা, উদার হৃদয়, ভগবন্নিষ্ঠ ফকীর সাহেব তাঁহাদিগকে বিশেষ নম্র ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, আমার দ্বারা আপনাদের অনিষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মন যার অশুদ্ধ, সংশয় তার চির সহচর। শ্রদ্ধা ভক্তি বা

বিশ্বাস সে প্রাণে স্থান পাইতে পারে না। ভেদ ভাবাপন্ন সন্ন্যাসীর দলও ইহার হাত এড়াইতে পারিল না।

পরদিন অতি প্রত্যুষে ভক্তবর ফকীর গাত্রোত্থান করিয়া নানা প্রকার উপাদেয় পুষ্প সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রস্ফুটিত রক্তজবা, পদ্ম, অপরাজিতা প্রভৃতি পুষ্পে তিনি একটী সাজী পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। ফকীর বড় ফুল ভাল বাসিতেন; নিজে যাহা ভাল বাসিতেন—প্রাণের দেবতাকে তাহা না দিয়া থাকা যায় না; ফকীর দেবোদ্দেশে উহা উৎসর্গীকৃত করিবেন বলিয়া সাজী সাজাইয়াছেন। প্রাতঃকালে জুয়ার আসিয়াছে, ফকীরের দরগার গাত্রে জাহ্নবীর প্রবল তরঙ্গ ঘাত প্রতিঘাত হইতেছে। ফকীর নিত্যকর্ম্ম নমাজ শেষ করতঃ ফুলের ডালাটী লইয়া একদৃষ্টে ভাগিরথীর নৃত্যলীলা অবলোকন করিতেছেন আর ভক্তির প্রবল তরঙ্গে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে।

পার্শ্বের আশ্রমে হিন্দু সন্ন্যাসিগণ প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন এবং প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া পুষ্প সংগ্রহ করিতে যাইলেন কিন্তু সে দিন আর কোথাও ফুল পাওয়া যাইতেছে না—ফকীর অতি প্রত্যুষে সমস্ত সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। ফকীর আসিতে না আসিতেই তাঁহাদের সাধনায় এইরূপ বাধা হইতে লাগিল দেখিয়া তাঁহারা দারুণ রাগান্বিত হইয়া ফকীরকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—এত ভণ্ডামী কেন! মুসলমানে কে কোথায় আবার ফুল দিয়া নমাজ করিয়া থাকে; ইহাতে বোধ হইতেছে— আমাদের অনিষ্ট করিবার জন্যই তুমি এখানে আসিয়াছ? ফকীরের প্রাণ তখন তদ্গত হইয়াছে, তিনি নিজস্ব হারাইয়া ভাব-বিভোর প্রাণে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন; দুনয়ন হইতে অনর্গল প্রেমাশ্রু

পতিত হইতেছে। হিন্দু সন্ন্যাসীদের সে তীব্র বচন তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল না; বহুক্ষণ পরে ফকীরের ধ্যানভঙ্গ হইলে কারণ বুঝিতে পারিয়া অতি বিনীত স্বরে বলিলেন—কেন আপনারা আমাকে বৃথা দোষ দিতেছেন, আমি সমস্ত ফুল তুলি নাই। আপনাদের বিলম্ব হওয়ায় বোধ হয় আর কেহ তাহা সংগ্রহ করিয়াছে।

সন্ন্যাসী। আর কে তুলিবে—ইহা তোমারই কাজ, আমাদের পূজার ব্যাঘাত করাই তোমার উদ্দেশ্য।

ফকীর। খোদার দোহাই; আমার যেন এরূপ উদ্দেশ্য জীবনে কখন না হয়। আচ্ছা, যদি আপনাদের একান্তই ফুলের অভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে না হয় আমার এই গুলিই গ্রহণ করুন ?

সন্ন্যাসীর দল তখন আরও রাগিয়া উঠিলেন, যবন পৃষ্ট পুষ্পে হিন্দুর দেবদেবীর পূজা হইবে, এত বড় কথা,—ইহার জন্য তাঁহারা ফকীরকে অনেক কথা শুনাইয়া দিলেন। ক্ষমাময় ফকীর তাহাদে বিন্দুমাত্র রুষ্ট না হইয়া বলিলেন—ঠাকুর! ফুল আবার হিন্দু মুসলমানের কি, যাহাদের এরূপ জ্ঞান তাহারা কি কখন গঙ্গাদর্শন করিতে পারে ? এই উদ্দেশ্যে তাহাদের এখানে সঙ্কল্প করিয়া অবস্থান করাও নিতান্ত বাতুলতা। ভেদজ্ঞান বিরহিত হইয়া দিব্যচক্ষু লাভ না করিলে মাতৃ-দর্শন সুদুর্লভ।

সন্ন্যাসিগণ ফকীরের মুখে নিজেদের প্রাণের গুপ্ত কথা প্রকাশ হইল দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে একজন মহাপুরুষ বলিয়া তাঁহাদের প্রতীতি জন্মিল। সন্ন্যাসিদলের কর্ত্তা প্রথম হইতে ফকীরকে একজন বিশিষ্ট ভক্ত বলিয়াই অনুমান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার অসীম ক্ষমতার বিষয় অবগত হইয়া বলিলেন—

আপনি কৃপা করিয়া আমাদের বাসনা ফলবতী করুন; আপনি একজন মহাপুরুষ আমরা জানিতে পারিয়াছি, আপনি কৃপা করিলে যে আমাদের মনোভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আর সংশয় মাত্র নাই।

ভগবদ্ভক্ত-মাতৃশক্তিসম্পন্ন সাধকের হৃদয় পবিত্র, মন সুনির্ম্মল, তাহাতে পার্থিব কোন প্রকার মলিনতা স্থান পায় না। সরলান্তঃকরণ ফকীর সন্ন্যাসীদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া সাজী সুসজ্জিত ফুলগুলি তৎক্ষণাৎ গঙ্গার পবিত্র সলিলে ভাসাইয়া দিতে দিতে বলিলেন—দেখিবেন, মায়ের পায়ে ফুলগুলি কিরূপ ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িবে? দৈবমায়া বুঝে কার সাধ্য! ফকীর যখন হৃদয়ের ভক্তিভরে, প্রেম গদ গদ কণ্ঠে :—

সুরধুনি মুনি কন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং।
স তরতি নিজ পুণ্যৈস্তত্র কিন্তে মহত্বম্।
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাম্।
তদপি তব মহত্বং তন্মহত্বম্ মহত্বম্।

বলিয়া ফুলগুলি স্রোতে ভাসাইয়া দিলেন—ফুলগুলি স্রোতে নাচিতে নাচিতে কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই, সলিল মধ্য হইতে দুইখানি ছোট রাঙ্গা টুকটুকে হস্ত টুপ্ টুপ্ করিয়া ঐ ফুলগুলি জলের ভিতর টানিয়া লইতে লাগিলেন। ফুল ভাসাইয়া দিয়াই ফকীর সমাধিস্থ, বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে। সন্ন্যাসী সকল তখন ফকীরের দৈবশক্তির অদ্ভুত পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার পদতলে লুটিয়া পড়িলেন। ফকীর চৈতন্যপ্রাপ্তির পর করযোড়ে, আহা! করেন কি, করেন কি, আমরা সকলেই অমৃতের সন্তান,—সেই ব্রহ্মময়ীর সোহাগসৃজিত ধন,

আমাদের মধ্যে ছোট বড় কিছু নাই। তবে কেহ তাঁহাকে দেখিবার চেষ্টা করে, কেহ করে না—প্রভেদ এই। আপনারা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, ভেদজ্ঞান বিরহিত হইয়া কায়মনঃপ্রাণে চেষ্টা করুন, মায়ের দর্শনলাভ ছেলের পক্ষে খুব সহজসাধ্য। এই বলিয়া তাহাদের সকলের পদধূলি গ্রহণ করত ভূমি হইতে হাতে ধরিয়া তুলিলেন। সন্ন্যাসিগণ আপনাদের ধৃষ্টতার জন্য ফকীরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন—যদি কৃপা করিলেন তবে অতৃপ্ত পিপাসিত প্রাণের চির-শান্তিবিধান করুন। ফকীর বলিলেন—আপনারাও নিতান্ত অকর্ম্মা নহেন—আপনাদের হৃদয়ও মাতৃভক্তি বিহীন নহে, চেষ্টা করুন, কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

এই দিন হইতে ফকীরের শিক্ষা অনুসারে তাঁহারা গঙ্গার আরাধনা করিতে লাগিলেন, তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত স্তব অহরহঃ পাঠ করিয়া দেবীর উদ্বোধন করিলেন। বাসনা সুসিদ্ধ করিবার জন্য একদিন তাঁহারা ফকীরকে সম্মুখে লইয়া যোগাসনে উপবেশন করতঃ তার স্বরে, ভক্তিপরিপ্লুত কণ্ঠে মাতৃগুণগান করিতে লাগিলেন।

ভক্তবৃন্দের কাতর আহ্বানে মায়ের আসন টলিল। প্রথমে সকলে মায়ের আলুলায়িত কুন্তলজাল দেখিতে পাইলেন, কিন্তু মায়া-পাশ-মুগ্ধ-জীব মায়ার আধার কেশজাল দেখিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। দর্শন লালসা আরও বলবতী হইল, একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষার-অনল যেন তাঁহাদের হৃদয়ের অন্তস্থলে দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, আশার ক্ষীণ আশ্বাসে আশ্বস্ত হইলে আকাঙ্ক্ষা বড়ই বাড়িয়া যায়—ইহাদের তাহাই হইয়াছে। এরূপ হইলে প্রাণের একাগ্রতার একটা উৎকট শক্তি আপনিই জাগিয়া উঠে, তখন সাধকের

সিদ্ধবস্তু লাভে আর অক্ষমতা থাকে না, মাতৃদর্শন তাহার করতলগত হইয়া পড়ে। এই সময় তাঁহারা দেখিলেন—মকরবাহিনী শ্বেতশতদল-বাসিনী মা সলিলোপরি আবির্ভূত হইয়া ভক্তগণের দর্শনসাধ মিটাইতেছেন—তাহাদের অভয় দিতেছেন। তখন সকলেই সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন—হিন্দুসন্ন্যাসিগণের আর চৈতন্য হইল না, তাঁহারা যোগাবলম্বনে দেহ ত্যাগ করিলেন। হিমালয় গিরিশৃঙ্গে তপস্যাকালীন ইহাঁদের পতন হইয়াছিল, আজ ত্রিবেণীতীরে মুসলমান ফকীরের কৃপায় তাঁহাদের উদ্ধার সাধন হইল। পাঠককে এই মুসলমান ফকীরের আর বিশেষ করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই, ইনিই আমাদের সাধকা-গ্রগণ্য দরাফ খাঁ, গৃহ-বহির্গত হইয়া কোনও মহাত্মার কৃপায় অশেষ শক্তিসম্পন্ন হইয়া এইবার স্বধামে নিজ আস্তানায় আসিয়া যোগসাধনায় রত হইলেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

দেবীর কৃপা।

বৃক্ষের উৎপত্তি-অবস্থা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, যদি ইহা দৈব-দুর্বিপাকে নষ্ট না হয় তাহা হইলে কালে ইহা কিরূপ সুফল প্রসব করিবে, কিরূপ সুশীতল ছায়া দানে পরিশ্রান্ত পান্থের দারুণ রৌদ্রতপ্ত প্রাণে শান্তির মলয়ানীল প্রবাহিত করিবে। মানুষের বাল্যকালই তাহার

সমস্ত জীবনের দর্পণ-স্বরূপ। বাল্যজীবন-দর্পণে যে ছায়াপাত হইবে, যে ভাবে বাল্য-জীবন গঠিত হইবে, বাল্য-জীবনে মানবের যে ভাবের আধিক্য দেখা যাইবে, মানুষ প্রায়ই সেইভাবে গঠিত হইয়া সারাজীবনটার লীলাখেলা সমাপন করিতে অভ্যস্থ হয়—ইহা স্বাভাবিক, মরজগতে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সাধক-চরিত্রের বাল্যকাল পর্য্যালোচনা করিলে আমাদের বাক্যের সত্যতার অভাব হইবে না। সেকালের নদীয়াবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, পরম-রামাৎ শ্রীমৎ তুলসীদাস, কবীর, অধুনা শ্রীবামাক্ষেপা প্রভৃতি ইহাঁদের পূতচরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে আমাদের কথার সত্যতা বেশ উপলব্ধি হইতে পারে। দরাফ খাঁর বাল্য-জীবনও এইরূপ মধুর ভাবে গঠিত হইয়াছিল, পুজনীয় পিতৃদেবের পবিত্র শিক্ষাগুণে অতীব ভক্তিভাবে অণুপ্রাণিত হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কোতলপুর গ্রামের পবিত্র রায় বংশের ভক্ত ধুরন্ধর জীবানন্দ যখন পুত্র হইল না বলিয়া পত্নী কমলার সহিত নিজ জীবনকে নিরানন্দময় করিয়া তুলিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়ে ভগবান তাহাদের তপে সন্তুষ্ট হইয়া এই প্রসাদী ফুলটুকু হেলায় প্রদান করিয়া পতিপত্নীর হৃদয়ে আনন্দের তুফান প্রবাহিত করিয়াছিলেন। ভক্তবীর জীবানন্দ যখন গৃহ দেবতা নারায়ণের পূজাদি সমাপন করিয়া তুলসীতলায় বসিয়া প্রেমবিহ্বল কণ্ঠে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে" বলিয়া সুর তুলিতেন, শক্তি-উপাসক জীবানন্দ হৃদ্-মাঝারে তাঁহার ইষ্টকালিকামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে শিবময় দেখিতে দেখিতে যখন কৃষ্ণনামে তন্ময় হইতেন, প্রেম ভক্তিস্রোতে নয়ন বহিয়া যখন ধারা প্রবাহিত হইত, তখন তিনবৎসরের দুগ্ধপোষ্য

শিশু মাতৃক্রোড় হইতে ছুটিয়া আসিয়া পিতার সহিত মিশিয়া হাততালি দিয়া "কেষ্ট-কেষ্ট হতে-হতে" করিয়া নৃত্য করিত, তুলসীতলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া যখন পবিত্র-ধূলায় মাখামাখি অঙ্গে উঠিয়া হেলিত-দুলিত, চলিত-বলিত, তখন ঠিক বোধ হইত যেন হরিনামে পাগল একটি ছোট শিবমূর্ত্তি ভক্তিপ্রাবল্যে মাতোয়ারা হইয়া মর্ত্ত্যে হরিনাম বিলাইতে আসিয়াছে। শিশুর সেই নবনী কোমল ও নধর অধরে যখন আধ আধ ভাঙ্গা ভাঙ্গা কৃষ্ণ বুলি ফুটিয়া উঠিত, তখন সে শ্রবণ সুখকর মধুর কথায় স্বামী স্ত্রী আনন্দে গলিয়া যাইতেন, শিশুর দ্বারা ভবিষ্যতে কত সুখের কল্পনা করিতেন। সেই শিশুই আজ দরাফ খাঁ রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বশতঃ বাল্য-জীবনের সুমতি-গতি লইয়া দরাফ জীবন মধ্যাহ্নে ভক্ত-শিরোমণি হইয়া পড়িয়াছেন—যাঁহার ভক্তি-প্রাবল্যে, সভক্তিক আহ্বানে জলদবরণ পাদপদ্ম সম্ভূতা জলরূপিণী জাহ্নবী উজান বহিয়া যান—যাঁহাকে কোলে লইবার জন্য মা আমার মকর বাহনে সাকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিতে সলিলোপরি আবির্ভূতা হন। দরাফ আজীবন ভক্ত, জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে ভক্তির অমিয় হ্রদে স্নাত, তাহাকে এ ভক্তি ভাব শিখাইতে হয় নাই—ইহা তাঁহার জন্মগত সংস্কার। ভক্ত চিরদিনই ভগবানের, ভগবানও চিরদিন ভক্তের ভক্তিডোরে বাঁধা। সতীর যেমন অন্যভাব থাকিলে, চিত্তে অন্যরূপ চাঞ্চল্য আসিলে ব্যভিচার দুষ্ট হয়, যেমন তাহার সতীত্ব আর থাকে না, ভক্তেরও তেমি চিত্ত অস্থির হইলে, ভক্তিভাবের অভাব হইলে ইহপরকাল নষ্ট হইয়া যায়। ভক্ত কেবল ইহ জীবনের কটা দিন তাঁহাকে লইয়া বিহার করিতে, তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে

করে না। ভক্ত মনে করেন—আমি যেখানেই যাই, যে জাতিতে আমার স্থিতি হউক, আপনার কর্ম্মফলে আমি যেখানে যার গৃহে জন্মাই না কেন, মা! তোমার পাদপদ্মে আমার ভক্তি যেন অচলা থাকে, আমি যেন চিরদিন তোমার হইয়া থাকিতে পারি। সংসাররূপ ভব পান্থশালায় আসিয়া আমি যেন কেবল কামনা বাসনার দাস হইয়া না পড়ি, তুমি শক্তির আধার, সর্ব্বশক্তিস্বরূপা—আমাকে এমনি শক্তি দান কর, যাহাতে কেবল তোমার প্রেমে মত্ত হওয়া ছাড়া আর কোন ব্যভিচার আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে, আর কোন কলঙ্কে যেন আমি কলঙ্কিত না হই। দরাফের চিত্ত এখন এইরূপ নির্ম্মল পবিত্রাদপি পবিত্র; প্রবৃত্তির সে ভীষণ ছায়া এখন আর তাঁহার পবিত্র হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না, এখন তিনি অনাহারে অনিদ্রায় যোগাসনে বসিয়া অষ্টাহ কালক্ষেপ করিতে পারেন—কোন কষ্ট বা মনের কোন চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না। পূর্ব্বে উদ্দাম প্রকৃতি বশে যখন দরাফ উন্মত্ত হইবার প্রয়াস পাইতেন—যখন প্রকৃতি বশে রাখিবার শক্তি তিনি হারাইয়া ফেলিতেন; মতিয়া তখন নিকটে থাকিয়া তাঁহার সে প্রবৃত্তির সমতার চেষ্টা করিতেন,কত বুঝাইতেন, কত বলিতেন—তবেও তাঁহার প্রাণে সুপ্ত শক্তি জাগিয়া উঠিত—প্রবৃত্তির নিবৃত্তি জন্য একটা প্রবল চেষ্টা তাঁহাকে সতত উত্যক্ত করিয়া তুলিত! বাণে ভাসিয়া আসার পর কিছুদিন তাঁহার চৈতন্য বিলোপ হইয়াছিল, প্রথমে ভুবনেশ্বরীর যত্নেই সে স্মৃতি জাগিয়া উঠে, তারপর ধর্ম্মকর্ম্মে মন দিয়া, সওদাগরের সাহায্যে নমাজাদিতে মনস্থির করিয়া তাঁহার কিয়ৎ পরিমাণে উন্নতি হইতে আরম্ভ হয়,তারপর মতিয়ার আন্তরিক যত্ন চেষ্টায়, তাঁহার জন্মার্জ্জিত সংস্কারের এবং আবাল্য অভ্যস্থ মতিগতি পুনরুদ্দিপ্ত হইয়াছে।

স্ত্রীই পুরুষের শক্তি জীবন পথের একমাত্র সহায় স্বরূপ অবলম্বন; ভাগ্যবশে যাহার ভগবতীর অংশ স্বরূপা—নিজ স্বভাবের অনুরূপা স্ত্রীলাভ হয়—এজগতে তাহার উন্নতির অবধি থাকে না; স্ত্রীই শক্তি, শক্তি ভিন্ন শিব যেমন শবপ্রায়, বুদ্ধি ভিন্ন চৈতন্য যেমন স্বরূপে অবস্থিত থাকিতে পারে না, সেইরূপ সহধর্ম্মিনী ভিন্ন ধর্ম্ম-জীবনেও উন্নতির পথ প্রশস্ত হয় না। স্বামীর যেমন স্ত্রীর আবশ্যক স্ত্রীরও তেমনি স্বামীর আবশ্যক—ধর্ম্ম জীবনে উভয়ে উভয়ের সহায় হইলে মুক্তি স্থির নিশ্চয়। দরাফের সহায় মতিয়া, মতিয়ার সহায় দরাফ, তাই আজ তাহাদের এত সৌভাগ্য সঞ্চার, জগন্ময়ী মা তাই আজ তাহাদের প্রতি এরূপ কৃপাময়ী।

বহুপূর্ব্ব হইতে দরাফের ভক্তিভাব, সাধন ক্ষেত্রে তাঁহার অত্যধিক সুযশ মহত্ত্ব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান সমাজ তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিত; একজন প্রধান ভক্ত বলিয়া তাঁহার পূজা করিতে কেহই কুণ্ঠিত হইত না।

যখন তিনি ত্রিবেণী তীরে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন; তখন চারিদিক হইতে ভক্তবৃন্দ তাঁহার সঙ্গ লাভের জন্য তথায় সমবেত হইল। জননী কমলা, পত্নী মতিয়া শুনিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন—তাঁহাকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য কত সাধ্য সাধনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সাধক সাধনার ধন জাহ্নবীর পবিত্র সদন ছাড়িয়া আর স্বভবনে গমন প্রয়াসী হইলেন না। তাঁহারাও তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করা যুক্তিসঙ্গত নয় মনে করিয়া তাঁহাকে সেই স্থানে থাকিতে দিলেন, কেবল অনুরোধ করিলেন—আর যেন এস্থান ছাড়িয়া কোথাও না যান। এখানে থাকিলেও জননী প্রাণ পুত্রকে ইচ্ছামত দেখিতে

পাইবেন, স্ত্রীও পূজনীয় স্বামি দেবতার পদপূজা করিয়া চরিতার্থ হইতে পারিবেন। পুত্র মহম্মদও তখন বেশ বড় হইয়াছে, পিতার প্রতি তাহার ভক্তিভাব সজাগ হইয়াছে; সেও ইচ্ছা করিলে তাঁহার চরণতলে বসিয়া দেহ মন জুড়াইতে পারিবে। এই জন্য তাঁহারা দরাফকে সেইস্থানে চিরস্থায়ী হইতে অনুরোধ করিলেন। ভক্তবীর দরাফ তখন উন্নত, ভক্তিমার্গের শীর্ষ সমাসীন, পতনের তখন আর কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি বলিলেন—মা! সম্ভবতঃ আমি এস্থান ছাড়িয়া আর কোথাও যাইব না। যদিও যাই—তথাপি ঠিক সময়ে আমাকে দেখিতে পাইবে; এই বলিয়া তাঁহাদের আশ্বস্ত করিলেন। দরাফের চাষ আবাদ, জমিদারী সমস্তই ঠিক ছিল, সংসার চলিবার কোন চিন্তা ছিল না, কেবল দেখিবার তেমন কেহ লোকজন ছিলনা বলিয়া তাহা শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সওদাগরের মৃত্যুর পর, প্রজাবর্গই সমস্ত লুটিয়া খাইত, হাতে তুলিয়া যাহা দিত তাহাতেই কমলা ও মতিয়া বংশধর পুত্রটীকে লইয়া সুখে কাল কাটাইত, এখন মহম্মদ বড় হইয়া নিজের গণ্ডা বুঝিয়া লইতেছে, কাজেই আর কোন গোলযোগ নাই। অর্থের প্রতি এ মুসলমান পরিবারের তত আগ্রহ নাই, তাই—প্রজাবর্গের প্রতি তত পীড়ন করা কখনই তাহাদের অভ্যাস নহে। মতিয়াত সংসারের কোন ধারই ধারিতেন না—তিনি ঠিক স্বামীর মত ভগবানে সমাহিত চিত্ত হইয়া জীবনের কটা দিন কাটাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন; আর প্রত্যহ একবার করিয়া ত্রিবেণী তীর্থে যাইয়া দেবতার পূত পাদোদক পান করিয়া আসিতেন; দেহের যত্ন, বেশভূষার কোন আড়ম্বর আর তাঁহার ভাল লাগিত না।

মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য—যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মানব ধরাতলে

জন্ম গ্রহণ করে, তাঁহাদের সেই উদ্দেশ্য যখন সুসিদ্ধ হইয়াছে, তখন এজগতে তাঁহাদের অপ্রাপ্য আর কি আছে? যাহা পাইলে সমস্ত পাওয়া যায়; সেই কাম্য বস্তুই যখন তাঁহাদের লাভ হইয়াছে; তখন এজগতে তাঁহাদের আর ভাবনা কিসের; বৃথা কেন বা আর তাঁহারা চিত্ত অস্থির করিবেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

একি ছলনা?

মন যদি পুরা ভক্তিপূর্ণ হয় এবং তাহা যদি দৃঢ় বিশ্বাসে মানব হৃদয়ে বদ্ধ মূল হইয়া যায়, তাহা হইলে তুমি যে জাতিই হও ভগবানকে পাইতে তোমার বিলম্ব হইবে না। ভক্তি—বিশ্বাসের বলে সুদৃঢ় করিলে তোমাকে আর কিছু সাধ্য সাধনার অপেক্ষা করিতে হইবে না, অনাহার অনশনে যোগযাগ করিয়া দেহ মাটী করিবার আবশ্যক নাই—তোমার হৃদয়নিহিত প্রবল ভক্তি বলই সেই ভক্ত বৎসলকে, সেই একমাত্র আরাধ্য বস্তুকে ধরিয়া দিতে সক্ষম হইবে। সাধন মার্গে ভক্তির তুল্য শক্তি আর কিছুরই নাই।

সত্য চিরকালই সত্য; সকল ধর্ম্মের সার ভাগ; হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান কাহারও সত্য পৃথক্ নহে। সত্যসনাতন ভগবান সত্যস্বরূপে সকল ধর্ম্মেই বিরাজমান, সেই বিশিষ্ট বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া সাধনা করিতে পারিলে তুমি যে ধর্ম্মাবলম্বী হও না কেন—তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবেই হইবে। ভগবানে একনিষ্ঠ হইয়া সাধন করিবার জন্ত যে মানব জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। ভগবান যে সকলকেই

সৃষ্টি করিয়া সমভাবে সাধনার ক্ষমতাপ্রদান করিয়াছেন, দয়াময় খোদাতাল্লার শ্রীমুখ নিঃসৃত কোরাণ তাহা গগনভেদী সুরে বলিতেছেন—

"ওয়ার্ মা খালাক তুল জিন্না
ওয়াল ইন্‌সা ইল্লা লেইয়াবুদুন ॥

ভগবৎ সাধনা ভিন্ন যে জীবের অন্য কোন কর্ম্ম নাই, উক্ত শ্লোক তাহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রের ন্যায় কোরাণও বলেন—

ইন্নাল্লা হা আলা কুল্লে সায়েইন কাদির।
ইন্নাল্লা হা আলা কুল্লে সায়েইন আলীম।
ইন্নাল্লা হা আলা কুল্লে সায়েইন সাহিদ।

ভগবান খোদা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন—এজগতের যাবতীয় পদার্থ আমার মুঠার মধ্যে, আমি ইহার প্রত্যেক অণুপরমাণুতে ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত; যে যে ভাবেই সাধনা করুক—আমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও করিতেছে না—ইহা স্থির নিশ্চয়; অতএব আমরা কেবল সেই অদ্বৈত ভগবানকে ভেদ ভাবে ভাবিয়া থাকি। ইহা সামাজিক বিধান ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে, যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে সমাজের সুনিয়মে তাহার জীবন গঠিত, যে বিধির বিধানে সে আজীবন আবদ্ধ—অভ্যস্থ, তাহার সেই বিধি বিধানে উপাসনা করিলেই নাকি—তাহা সহজ ও সুগম হইয়া থাকে, এই জন্য প্রারম্ভাবস্থাতে সকলকেই সেই বিধি-নিষেধের সুশীতল ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া সিদ্ধিলাভ করা উচিত, নতুবা সে কিছুতেই প্রেম

লাভ করিতে পারিবে না; তারপর সাধক পদবাচ্য হইয়া সাধ্য-বস্তু লাভে কৃতার্থ হইলে, ব্রহ্মবস্তু লাভে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে, তখন তাহার কথা স্বতন্ত্র, তিনি ইচ্ছা করিলে শাস্ত্রের বিধি নিষেধ মানিতে পারেন—নাও পারেন তখন, এ সকল তাঁহার ইচ্ছাধীন, কিন্তু সাধনা কিছুই হইল না, একেবারে ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া যিনি ভ্রষ্টাচারী হইলেন, তাঁহাকে ধর্ম্মধ্বজী ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? আমা-দের তন্ত্র শাস্ত্রে যেমন পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাবে সাধনা করিতে হয়, কোরাণেও সেইরূপ শালিক, সুফী ও মজুজ তিন শ্রেণীর সাধক আছেন, শালিক সাধকগণ শাস্ত্রের যাবতীয় নিয়ম প্রতিপালন করিয়া খোদার আরাধনা করেন। সুফীগণ হিন্দুর বীরাচারী তান্ত্রিক সাধকের ন্যায় সাধনা করিয়া থাকেন। আর মজুজ—ইঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত সাত্বিক ভাবাপন্ন, কর্ম্মকাণ্ড ইহাঁদের শেষ হইয়াছে, জগতের প্রত্যেক বস্তুতে ইহাঁরা ভগবদ্দর্শন করিয়া ঈশ্বর ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন।

আমাদের সিদ্ধ সাধক দরাফ খাঁ সুফী শ্রেণীর সাধক ছিলেন। তিনি কর্ম্মকাণ্ডে বিশেষ ভাবে অভ্যস্থ ছিলেন; অনেকটা তন্ত্রের মতে কার্য্য করিতেন, গুরু রামানন্দ তাঁহাকে যে ভাবে চলিতে শিক্ষা দিয়া-ছিলেন—তিনি এতকাল সেইভাবে চলিয়া এক্ষণে অবস্থার ক্রমোন্নতি লাভ করিয়াছেন। দরাফ প্রত্যহ রজনীর শেষ যামে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করতঃ নমাজে প্রাণমন সমর্পণ করেন। দিবসে পাঁচবার নমাজ তিনি করিতেনই, তাহার কখনও ক্রটী হইত না। এক একদিন তাহার হৃদয় প্রেমে এমন বিহ্বল হইয়া যাইত, ভক্তিতে তিনি এমন বিভোর হইয়া পড়িতেন যে নমাজের

পর যখন তিনি একদৃষ্টে তাঁহার প্রাণের দেবী গঙ্গার প্রতি বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইয়া থাকিতেন, তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান রহিত হইত, সেদিন আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইয়া কেবল বলিতেন ;—

সুরধুনী মুনি কন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং।
স তরতি নিজপুণ্যৈ স্তত্র কিন্তে মহত্বম্।
যদি চ গতিবিহিনং তারয়েঃ পাপিনং মাম্।
তদপি তব মহত্বং তন্মহত্বং মহত্বম।

দরাফ খাঁর এই সময়কার ভাব যাঁহারা দেখিয়াছেন—যাঁহারা সেই সুকোমল ভক্তকণ্ঠে ভক্তিমাখা স্তবধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন—তাঁহারাই তাঁহাকে একজন অসাধারণ ভক্ত জ্ঞানে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

একদিন দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন সময়, প্রদীপ্ত রবিকরে যেন চারিদিক ঝলসিয়া যাইতেছে; পল্লীর গৃহস্থ গৃহ কর্ম্ম সমাধা করিয়া কেহ চণ্ডীমণ্ডপে পড়িয়া নিদ্রা যাইতেছে; কোথাও বা কোন বৃদ্ধ নিজের দাওয়ায় বসিয়া ঢেরা ঘুরাইয়া পাটের দড়ী প্রস্তুত করিতেছে; অদূরে বৃদ্ধা গৃহিনী "ঘেনোর ঘেনোর" করিয়া চরকার সাহায্যে সূতা প্রস্তুত করিতেছে; বাটী হইতে কেহ বাহির হইতে পারিতেছে না বলিয়া ঘরে বসিয়া যে যার কাজে মন দিয়াছে—নিষ্কর্ম্মা কেহই নাই। পল্লীজীবন তখন এইরূপ কর্ম্মভরা ছিল বলিয়া তখন সুখ ছিল, শান্তি ছিল, জীবন সংগ্রামে তখন এখনকার মত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত না; বিলাসিতা তখন এরূপ ভাবে আমাদের জীবনকে অকর্ম্মণ্য করিয়া নাটক-নভেলের, আশ্রয়ে আশ্রিত করিয়া দেয় নাই; তাই তখন সবল ও সুস্থ-

দেহে আমরা সুখে জীবন অতিবাহিত করিতাম; বহু বৎসর আনন্দ কোলাহলে জীবন-নাটকের পট পরিবর্ত্তন করিয়া অবশেষে ধর্ম্মাশ্রয়ে তাহার যবনিকাপাত করিতাম, দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া নিরোগ শরীরে কত অসাধ্য সাধন করিয়া আপনি ধন্য হইতাম, দেশকে ধন্য করিতাম—হায়! এখন সেদিন গিয়াছে,এখন স্ত্রীলোক কুড়ি হইলেই বুড়ি, পুরুষের পঞ্চাশ হইলেই পঞ্চত্ব প্রাপ্তির দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসে। এই দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে ত্রিবেণীর রাস্তা ঘাটে কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না তথাপি গ্রামটী যেন সজাগ আছে; সকলে গৃহে বসিয়া আপন আপন কর্ম্ম করিতেছে, তাহা চরকার শব্দ ও অদূরে কলুর ঘানির শব্দ শুনিলেই বেশ প্রতীয়মান হয়। সাধক দরাফ খাঁও সে দিন প্রাতঃকাল হইতে আপন হারা হইয়া মায়ের কোলে বসিয়া আছেন; প্রাতঃকালে মাতা ও পত্নী আসিয়া ছিলেন কিন্তু তাঁহারা তাঁহার অন্যকার ভাব দেখিয়া কোনও কথা হইবে না ভাবিয়া সে দিনকার মত চলিয়া গিয়াছেন। কমলা ও মতিয়ার প্রাণ আর গৃহে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না, তাঁহারা কেবল তাহাদের এই প্রাণধনের নিকট অহরহঃ বসিয়া থাকিতে চান কিন্তু পুত্রটীর জন্য তাহা হয় না। তাহাকে এখন কোন প্রকারে সংসারী করিয়া দিয়া সংসারে অবসর গ্রহণ করিতে পারিলেই তাহাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি হয়; আর দরাফও তাঁহাদিগকে সেইরূপ উপদেশই প্রদান করিয়াছেন। তাই তাঁহারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও গৃহে যান—আবার আসেন; এখন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় পুত্রের একটী বিবাহ দিতে পারিলেই তাঁহারা অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন। মধ্যাহ্নের দারুণ রৌদ্র একটু কমিয়া আসিল; কিন্তু তখনও পথে ঘাটে কোন লোকজন বাহির হয় নাই; চাতক কেবল

"ফটিক জল, ফটিক জল" করিয়া হাঁকিয়া ফিরিতেছে, আর এক একটী গাভী রোমন্থন করিতে করিতে একবার এ গাছের একবার ও গাছের তলায় কষ্টে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঠিক এই সময়ে ত্রিবেণীর গ্রাম্য পথে "মা ঠাকরুণ শাঁখা নেবেগো" বলিয়া একজন ফেরিওয়ালা হাঁকিয়া যাইতে লাগিল। বৃদ্ধ বৃথাই হাঁকিতেছে—কেহ তাহাকে ডাকিতেছে না—পথে লোকজন নাই, ভীষণ রৌদ্রে যুবতীরা ঘরের মধ্যেই পুত্র কন্যার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে, বর্ষিয়সীরা কর্ম্মে ব্যস্ত, কাজেই বৃদ্ধের শাঁখার খরিদ্দার কেহ জুটিতেছে না। সমস্ত দিন সে এ গ্রাম সে গ্রাম করিয়া কিছু বিক্রী না হওয়ায় ত্রিবেণী গ্রামে আসিয়া গ্রামের মধ্যে যাইতেছে। ত্রিবেণীর ঘাট হইতে প্রায় আধ ক্রোশ দূরে গিয়াছে, এমন সময় অতি সুরূপা স্বর্গের দেবী স্বরূপা একটী কুমারী একটী বৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইয়া বলিল—হ্যাঁগা আমাকে শাঁখা পরাইয়া দাও না।

সমস্ত দিনের পর একটী ক্রেতা পাইয়া বৃদ্ধ গাছতলায় আপন ঝাঁকাটী নামাইয়া বালিকার নিকট সমস্ত দেখাইতে লাগিল।

বালিকা একযোড়া শাঁখা পছন্দ করিয়া বলিলেন,—আমাকে এই যোড়াটী পরাইয়া দাও।

বৃদ্ধ বলিল—মা! আজ আমার সমস্ত দিন বহনী হয় নাই; তুমি অগ্রে ছয় আনার পয়সা দাও দেখি, আমি পরকা করি।

কুমারী বলিলেন—দেখ, আমি দ্বারবাসিনীর জমীদার দরাফ খাঁর মেয়ে, তিনি ত্রিবেণীর ঘাটে দরগায় আছেন, আমি তাঁর কাছ থেকে বাড়ী যাচ্ছি; হয় আমার সঙ্গে বাড়ীতে এস, না হয় বাবার কাছে যাও, তিনি পয়সা দিবেন। যদি পয়সা খুঁজিয়া না পান, তাহা হইলে বলিও, দরগার তাকের উপর পয়সা আছে।

জমীদার দরাফখাঁর নামে তখন সকলেই প্রবল বিশ্বাস করিত, বিশেষতঃ তাঁহার ধর্ম্মভাব ও বদান্যতা চারিদিকে এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে সে অঞ্চলের লোক দরাফখাঁর নামে গলিয়া যাইত। বৃদ্ধও দরাফ খাঁর নাম শুনিয়া ছিল, তাঁহাকে মস্ত বড় জমীদার ও দাতা বলিয়া সে জানিত, তাঁহার কন্যা শাঁখা পরিতে চাহিতেছেন—না দিলে কি ভাল দেখায়, শাঁখারী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বালিকাকে তাঁহার মনোমত শাঁখা পরাইয়া দিল এবং বলিল যে মা! আমি আর দ্বার-বাসিনীতে যাইব না, সে অনেক দূর, আমি দরগা হইতেই তোমার বাপের নিকট পয়সা লইব। তুমি ঘরে যাও। তখন দেশে বিশ্বাস ঘাতকের সংখ্যা অল্প ছিল বলিয়া বিশ্বাসেই আদান-প্রদান, কাজ কার-বার চলিত। কুমারী গ্রাম্য পথে অদৃশ্য হইয়া গেলেন, বৃদ্ধও ফিরিয়া আসিয়া ত্রিবেণীর দরগায় উপস্থিত হইল। দরাফ সেইমাত্র নমাজ সারিয়া খোদার ভাবে বিভোর হইয়া তার প্রাণের আরাধ্যদেবীর দর্শন লালসায় একদৃষ্টে সেই সুর-শৈবলিনী, ভীষ্ম জননী, জাহ্নবী সলিলে চাহিয়া আছেন। শাঁখারী ত তাহার সে ভাব জানে না। সে উপস্থিত হইয়াই বলিল—মিয়াসাহেব! বন্দেগী।

দরাফ চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন—একজন বৃদ্ধ তাহাকে সেলাম করিতেছে। তিনি প্রতি নমস্কার করিলেন এবং হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে পরিশ্রান্ত ভাবিয়া দরগায় বসিতে বলিলেন—ইষ্ট আরাধনার ব্যাঘাত হইল বলিয়া কোন প্রকার বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন না। দরাফের মাতৃ সম্মিলন, তাহার চরণ দর্শন ত কষ্ট সাধ্য নয়; তিনি যে মাকে ভক্তি শৃঙ্খলে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়াছেন; তিনি যে মাতৃভাবে তন্ময়, ইচ্ছা হইলেই যখন দর্শন হয়, তখন অতিথির

আগমনে একটু ব্যাঘাত হইল বলিয়া বিরক্ত হইবেন কেন? যাহা দুষ্প্রাপ্য, সহজে পাওয়া যায় না, তাহা হারাইলে কষ্ট, মনোবেদনা হয় আর ডাকিলে বা হাত বাড়াইলে যাহা লাভ হয়, তাহার জন্য অতিথির প্রতি বিরক্তি আসিতে পারে না, ইহাও তাঁহার দান—এই দুরন্ত মধ্যাহ্নে ইহার আগমনেরও একটা কারণ আছে ভাবিয়া দরাফ তাহাকে বসিতে বলিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কি জন্য আগমন হইয়াছে—তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

বৃদ্ধ বলিল—হুজুর! আপনার কন্যা আমার নিকট এক জোড়া শাঁখা পরিয়া বাড়ী গিয়াছে এবং আমাকে আপনার নিকট হইতে দাম লইতে বলিয়াছে; তাই দাম লইতে আসিয়াছি, আমার ছয় আনার পয়সা দিন।

দরাফ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন--বাপু! তুমি এ কি অসম্ভব কথা বলিতেছ? আমার ত কন্যা নাই; তুমি কাহাকে শাঁখা পরাইয়া আমার নিকট পয়সা চাহিতে আসিয়াছ; বোধ হয়—তোমার ভুল হইয়াছে।

বৃদ্ধ। না মিয়া! আমার ভুল হয় নাই, একটী টুকটুকে মেয়ে, ঠিক অপনার গায়ের রঙ্গ, আপনার মত খুব-সুরত চেহারা; বল্লে, দরগায় বাবার কাছে থেকে পয়সা নাওগে যাও।

দরাফ। তাহা হইলে সে ভুল বলেছে, আমার মেয়ে নাই; তবে যদি তুমি কাহাকেও দিয়ে থাক, না হয় আমিই দাম দিচ্ছি, তার আর ভাবনা কি?

বৃদ্ধ। না হুজুর! তা নয়, তিনি আরও বল্লেন—বাবা যদি পয়সা খুঁজে না পান, তাহা হইলে দরগার তাকের উপর ছয় আনার পয়সা আছে, দিতে বলো।

সন্দেহ ও আশ্চর্য্যে দরাফের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, তিনি তাড়াতাড়ি গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তাকে হাত দিয়া দেখিলেন—বাস্তবিক ছয় আনার পয়সা তথায় মজুত রহিয়াছে। আশ্চর্য্যের উপর আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তিনি পয়সা হাতে করিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন—হাঁ বাপু! মেয়েটী কোথায় তোমার নিকট শাঁখা পরিল, সে গেলোই বা কোথায়! চল দেখি একবার অন্বেষণ করি; বলিয়া শাঁখারীকে লইয়া দরাফ ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিলেন কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না। বাটীতে যাইবার মনস্থ করিলেন কিন্তু সে যে অনেক দূর; দূর হউক, কেহ না কেহ পরিয়াছেত; ছয় আনার পয়সা না হয় দেওয়াই যাক্। এই বলিয়া পুনরায় দরগায় আসিয়া বসিলেন। শাঁখারী বড়ই বিব্রতে পড়িল, একে সমস্ত দিন বহুনী হয় নাই। যদিও একজোড়া বিক্রয় হইল, তাহার মূল্যেও আবার ফাঁকী পড়িবার সম্ভাবনা; এই মনে করিয়া সে বিরস বদনে আসিয়া দরাফের মুখের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিল।

দরাফ জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁহে! পয়সার জন্য ভাবনা নাই; সত্য কি তুমি কাহাকেও শাখা পরাইয়াছ? সে দেখিতে কেমন?

বৃদ্ধ। মিঞা! আমি কি মিথ্যা বলিতেছি; মেয়েটীর ঠিক আপনার মত সুন্দর চেহারা।

সে বিরস বদনে আসিয়া দরাফের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিল।

বৃদ্ধের বাক্যে দরাফের অবিশ্বাস হয় নাই। কিন্তু এ কি! তাহার ত কন্যা সন্তান নাই—একমাত্র পুত্র, তবে এ কাহার ছলনা, মা! বলিয়া দাও; আমার কন্যারূপে কে বৃদ্ধের নিকট শাঁখা পরিয়াছে? আমার মনের সন্দেহ দূর কর মা। বলিয়া

দাও কে সে; এই বলিয়া বিষম সন্দেহে, আত্ম-ভোলা ভাবে দরাফ তাহার সর্ব্বসন্দেহ-ভঞ্জন-কারিণী মায়ের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, আর বৃদ্ধও হতাশ হইয়া আনমনে আপন অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতেছে। এমন সময় দুইখানি সুন্দর টুকটুকে শাঁখা-পরিহিত-হস্ত জলের উপর ভাসিয়া উঠিল, দরাফ চক্ষে দেখিলেন এবং শুনিতে পাইলেন—যেন কে বলিতেছেন—"বাবা দরাফ! পয়সা দাও; এই দেখ আমিই শাঁখা পরিয়াছি। দরাফ মা মা বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। ভাবাবেশে বিভোর হইয়া বৃদ্ধ শাঁখারীর সহিত কোলাকুলী করিলেন,—তাহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া মস্তকে প্রদান করিয়া বলিলেন—বৃদ্ধ! বিনা তপস্যায় তুমি ভবের আরাধ্য ধনকে শাঁখা পরাইয়াছ; ধন্য তুমি তোমার শাঁখার ব্যবসাও ধন্য! এই লও তোমার শাঁখার মূল্য; এবার হইতে যে কোন কুমারী তোমার নিকট শাঁখা পরিতে চাহিলে তাহাকে শাঁখা পরাইয়া দিও; এবং আমার নিকট হইতে তাহার মূল্য গ্রহণ করিও। এই বলিয়া দরাফ বৃদ্ধকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন এবং আপন দরগায় আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া বিভোর প্রাণে বসিয়া রহিলেন।

সমস্তদিন আহার হইল না। রাত্রি একপ্রহরের সময় জননী কমলা নানাবিধ ক্ষীরসর-নবনী প্রস্তুত করিয়া পৌত্র সহ দরগায় আসিয়া পুত্রকে আহার করাইলেন। দরাফ আজ তাঁহার গর্ভধারিণী জননীতে বিশ্বজননীর সমস্ত ভাব পরিস্ফুট দেখিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া স্বর্গের সুখানুভব করিতে লাগিলেন। ত্রিবেণী তীরে আজিকার রজনী স্বর্গীয় প্রেমানন্দে অতিবাহিত হইয়া গেল।

উপসংহার

দরাফ খাঁ এখন হিন্দু ও মুসলমান সকলেরই প্রিয় হইয়াছেন। সকলেই তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে—ভক্তি করে, তাহার শ্রীমুখ নিঃসৃত উপদেশাবলী দেবাদেশ জ্ঞানে শিরোধার্য্য করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করে। কত শাস্ত্রপাঠী পূতচিত্ত ব্রাহ্মণ ত্রিবেণীর গঙ্গাগর্ভে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া তাঁহার সুমধুর স্তোত্র পাঠ করত ভক্তিভাবে বিভোর হইয়া অশ্রুনীরে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করেন, বয়ঃ প্রবীন ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু মুসলমান গৃহ-কর্ম্ম সমাধা করিয়া প্রত্যহ ত্রিবেণী তীরে আসিয়া মহাত্মা দরাফ খাঁর সহিত মিলিত হইয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেন। গঙ্গাভক্ত দরাফের চিত্ত এখন তদীয় আরাধ্য দেবীর পবিত্র সলিলের ন্যায় নির্ম্মল—তাহাতে কোন প্রকার মলিনতা স্থান পায় না। মুসলমান সাধক দরাফ অনবরতই মায়ের নামে বিভোর; প্রাতঃকালে নমাজ পাঠের পর সেই যে তন্ময়তা সেই যে সমাধির ভাব তাহাতে জড়ীভূত হইয়া যায়, সমস্ত দিন সাধকের আর তাহাতে বাহ্য জ্ঞান থাকে না, সন্ধ্যার পর স্নানাদি করিয়া মায়ের স্তব পাঠ করিতে করিতে নমাজ পাঠে তিনি প্রায় দুই ঘণ্টার পর আবার বাহ্য চৈতন্য প্রাপ্ত হন। দরাফের এই ভাব দেখিয়া স্নেহময়ী কমলা আর গৃহবাসে অবস্থান করিতে পারেন না, প্রত্যহ আহারাদি প্রস্তুত করিয়া পৌত্র সমভিব্যাহারে এখানে আসিয়া উপস্থিত হন; রাত্রে পুত্রকে আহার করাইয়া প্রাতে গঙ্গা স্নান করিয়া বাড়ী গমন করেন, আবার বৈকালে আহারীয় লইয়া আগমন করেন কিন্তু এরূপ আর কত দিন চলিবে? মতিয়া ত গৃহে থাকিতে চাহে না; তাহার প্রাণের

প্রাণ আরাধ্য দেবতা ত্রিবেণীর ঘাটে একাকী রহিলেন, আর তিনি সংসার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া গৃহে বসিয়া পরকাল নষ্ট করিবেন; দেবতার সেবায় নারী-জীবনের সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন না?

মতিয়া শাশুড়ীর সহিত পরামর্শ করিয়া নিকটবর্ত্তী কোঁচাটী গ্রামের একটী প্রসিদ্ধ মুসলমান বিধবার একমাত্র কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিলেন। একদিন ইহার সময় বেশ ভাল ছিল, দশজনে গণ্যমান্য করিত কিন্তু স্বামী বিয়োগের পর হইতে তাহার অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছে তবে বংশ অতি পবিত্র; কন্যাটীও দেখিতে অপ্সরীর মত, বয়স্থা ভদ্রোচিত গুণ সম্পন্না; আচার ব্যবহারও যার পর নাই সুন্দর, কোন প্রকার গোলযোগ নাই; কন্যাটী পুত্রের অনুরূপা বিবেচনা করিয়া মতিয়া শাশুড়ীর পরামর্শ মতে শুভ পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। দরাফকে একথা জানান হইল—তিনি বলিলেন—মা! তুমি যাহা করিবে, যাহাতে তোমার মত, তাহাতে কি আমার কখন অমত হইতে পারে? মাতৃ আজ্ঞায় কার্য্য করিয়া কে কবে দুঃখে পড়িয়াছে, তোমার আদেশ দেবাদেশ, যাহা ভাল বিবেচনা হইয়াছে—করিয়াছ। তাহার উপর আমার আবার মতের অপেক্ষা কেন?

বিবাহে যৌতুকাদি কিছু পাওয়া গেল না। কারণ বিধবা অতি দরিদ্র; দৈনিক গুজরাণই চলিত না, তা কন্যার বিবাহে জামাতাকে যৌতুক দিবে কেমন করিয়া। তবে বিনা যৌতুকে যে রত্ন গৃহাগত হইল; তাহা দুর্ল্ভ. যৌতুকের আকাঙ্ক্ষা করিলে এমন রত্ন গৃহে আনা অসম্ভব। যাহার ভগবদ্দত্ত গুণ আছে—তাহার অর্থ নাই; যাহার অর্থ আছে—তাহার রূপ ও স্বর্গীয় গুণের এমন একত্র সমাবেশ

কোথাও পাওয়া যায় না। মতিয়া ও কমলা তাহাতে দুঃখিত নহেন—তাঁহাদের অর্থাদির অভাব কি? লোক অভাবে তত্ত্বাবধান করিবার লোক না থাকায় তাহাদেরই কত বিষয় কত দিকে নষ্ট হইতেছে, তা পরের নিকট অর্থ লইয়া গৃহজাত করিয়া আর কি করিবেন, আর সে আশাই বা তাহাদেব মনে স্থান পাইবে কেন? পুত্র মহম্মদের সহিত দুলিয়া বিবির যে মিলন তাহা রাজ যোটক হইয়াছে তাহারা যে উভয়ে সুখী হইয়াছে, ইহাতেই মাতা ও পিতামহী যার পর নাই সুখানুভব করিতে লাগিলেন।

এইবার তাঁহারা বিধবা মুন্নাকে সংসারের যাবতীয় ভার অর্পণ করিয়া দরাফের সহিত গঙ্গাবাসী হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। মুন্না বলিলেন—তাহাতে ক্ষতি নাই, মহম্মদ ও আমার পুত্রটী (দলিয়ার ভ্রাতা) বিষয় আশয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে পারিবে। আর তোমরা ত নিকটেই রহিলে; কোন বিষয় গোলমাল ঠেকিলে, জিজ্ঞাসা করিলেই হইবে।

স্বামিসোহাগিনী মতিয়া পুত্র ও পুত্রবধুর মস্তকাঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করিয়া শাশুড়ীর সহিত গঙ্গাবাসী হইলেন। ধার্ম্মিক মহম্মদ প্রত্যহ আহারাদির পর তথায় অবস্থান করত পরম গুরু পিতামাতার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া সন্ধ্যার পর বাটী আসিতেন। জীবনে ইহাই তাঁহার নিত্যকর্ম্ম হইয়াছিল। যখন লোক জনের সমাগম বেশী হইতে লাগিল; যখন ঐ দরগায় আর লোক সঙ্কুলান হয় না, প্রবাদ আছে—তখন দেবাদেশে দরাফ গাজীর স্বতন্ত্র আস্তানা নির্ম্মাণ হইতে আরম্ভ হইল। মাতৃ আদেশে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা ইহার নির্ম্মাণ ভার লইয়াছিলেন। কিন্তু এ সমস্ত বিষয়ে সাধকের তত ইচ্ছা ছিল না—কারণ অতিরিক্ত

লোক সমাগম হইলেই তাঁহার সাধনার ব্যাঘাত হইবে। কিন্তু যাঁহার ইচ্ছায় বিশ্বনির্ম্মিত, তাঁহার ইচ্ছায় যখন এ কার্য্য হইতেছে, তখন আর অপর কি করিবে? এক রজনীর মধ্যে ঐ কার্য্য শেষ হইবে—এইরূপ ইচ্ছা করিয়া বিশ্বকর্ম্মা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতীজ্ঞা করিলেন—রজনী প্রভাত হইলে আর কাজ করিব না।

সেই দিন গভীর রজনীতে গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য দেবশিল্পিগণের দ্বারা সমাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু যাহার কাজ, তাহার সে সৌভাগ্য চিন্তা আদৌ নাই; তিনি যেন ঐ সকল বিষয় অতি তুচ্ছ জ্ঞান করেন, দরাফ অট্টালিকাবাসী হইবার আশায় মায়ের প্রাণে প্রাণ মিশান নাই—মাতৃনামে নিজস্ব হারাণ নাই। তিনি মায়ের হইতে চাহেন; মাতৃভক্ত পুত্রের মত মায়ের কোলে বসিয়া খেলা করিতে তাঁহার ইচ্ছা, যে ছেলে মাতৃ ক্রোড়লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত, জাগতিক অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে তাঁহার আসক্তি কোথায়? তিনি কোন বিষয় গ্রাহ্য না করিয়া রজনীর গভীর যামে সেই প্রাণ মাতান, মনভুলান ও ভক্তিমাখা স্তব উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে লাগিলেন। এই সুধামাখা, শ্রুতি সুখকর স্তব-সংগীতের স্বরলহরী চারিদিক মুখরিত করিয়া দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িল। দেবশিল্পিগণ শুনিয়া মুগ্ধ—আত্মহারা হইয়া গেল, যতক্ষণ তাহারা শুনিতে পাইল, ততক্ষণ আনমনে হস্তচালন করিতে লাগিল বটে কিন্তু কাজশেষ করিতে পারিল না, পরন্তু একখানি কুঠার ভিত্তির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। যখন তাহাদের চৈতন্য হইল, তখন ভোর হইয়াছে, কাজেই ছাদ বিহীন গৃহ অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া রহিল এবং কুঠারটীও তাহার মধ্যে আবদ্ধ ভাবে রহিল।

দরাফ গাজীর অসম্পূর্ণ গৃহ ভিত্তিতে এখন সেই কুড়ুল বর্ত্তমান। প্রবাদ আছে—"দরাফ গাজীর কুড়ুল নড়ে চড়ে পড়ে না।" অনেকে টানিয়া দেখিয়াছেন—তাহা নড়িতেছে কিন্তু কেহ খুলিতে পারে না। শুনা যায় প্রায় দ্বাদশ বৎসর ত্রিবেণীতীরে সাধনা করিয়া সাধক-প্রবর দরাফ খাঁ সস্ত্রীক পার্থিব দেহ ত্যাগের জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন। তাঁহার জননী কমলা তাঁহাদের মৃত্যুর পূর্ব্বে গঙ্গাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সাধক মৃত্যুর পূর্ব্বে সমস্ত জানিতে পারিয়াছিলেন, পুত্রকে ডাকিয়া তাঁহাদের তিরোধানের বিষয় জ্ঞাপন করিলেন, মহম্মদ কাঁদিয়া আকুল হইল, বধূমাতা ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। মতিয়া বলিলেন—মা! জগতের গতি এই, বুদ্ধিমতি তুমি, যখন আমাদের জন্য তোমার মনপ্রাণ বেশী চঞ্চল হইবে, তখন মহম্মদের পদ-ধূলি স্পর্শ করিও, সকল শোকে সান্ত্বনা লাভ করিবে। সতীর পক্ষে স্বামিপদ অমূল্য সম্পদ। স্বামীর পদে ভক্তিযুক্ত হইতে পারিলে ত্রিজগতে স্ত্রীজাতির আর কিছুরই অভাব থাকে না; তারপর পুত্রকে নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া সান্ত্বনা করিলেন। মহম্মদ পিতা মাতার উপযুক্ত পুত্রত বটে, সে বুঝিল পিতা মাতা পার্থিব দেহ ত্যাগ করি-লেন কিন্তু মানুষত অমর, তাহাদের দেহ ত্যাগে ক্ষতি কি? দেবতা ত হৃদয়েই থাকেন, লীলায় মত্ত হইয়া এতদিন বাহিরে ছিলেন; এখন অন্তরস্থ হইলেন—চক্ষু মুদিলেইত দেখিতে পাইব তবে আর চিন্তা কেন, এই বলিয়া আশ্বস্ত হইলেন।

একদিন শুভ সৌম্য প্রভাতে যখন শাখী শাখে পাখিগণ, মহামায়ার প্রভাত-আরতী গাহিতেছে; পূর্ব্বদিকে রক্তিমরাগে স্নিগ্ধ কিরণে রবির উদয় হইতেছে, ঠিক সেই সময় দরাফ ও মতিয়া পূর্ব্বমুখে গঙ্গার

আকণ্ঠ জলে দাঁড়াইয়া সেই হৃদয়দ্রবকারী স্তোত্র পাঠ করিতেছেন আর একদৃষ্টে দিবাকরের প্রতি চাহিয়া আছেন—প্রভাতকালীন বালার্ক যেন পরমভক্ত দরাফের দেহত্যাগ দর্শন করিতে না পারিয়া দুঃখে কাঁপিতে লাগিলেন। দরাফ যুক্তকরে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—

সুরধুনী মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
স তরতি নিজপুণ্যৈ স্তত্র কিন্তে মহত্বম্।
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং।
তদপি তব মহত্বং তন্মহত্বং মহত্বম্।

মতিয়া ভক্তিভরে গলবস্ত্রে বলিলেন :—

সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ।

তারপর সব স্থির হইয়া গেল, পবিত্র শব দুইটী দুই স্রোতোপরি ভাসিতে লাগিল। মহম্মদ পিতামাতার আদেশ মত গলদশ্রুলোচনে—শোকবিহ্বল চিত্তে শবদেহ দুইটী ধারণ করিয়া তাঁহার দরগার পার্শ্বে সমাহিত করিলেন। এবং একটী ফকীরকে ঐস্থানে সেবাইত করিয়া বসাইয়া রাখিলেন। নিজে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তথায় আসিয়া সান্ধ্য নমাজ পাঠ করিতেন। মহম্মদের আসিতে বিলম্ব হইলে ফকীর কবরে চেরাগ-বাতি দিত, ভোগের জন্য দুগ্ধ প্রদান করিত। এই ফকীরের সপ্তম পুরুষ এখনও ঐস্থানে বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার নিকট দরাফের পবিত্র কাহিনী অনেকেই শুনিয়াছেন।

মাঘমাসে উত্তরায়ণ দিনে দরাফের সমাধি স্থানে একটী মেলা হয় এবং বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। স্থানটী হিন্দু ও মুসলমান জাতির মহাতীর্থস্থান বলিয়া এখনও প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছে।

উপসংহার

আমাদের পূজনীয় সাধকাগ্রগণ্য দরাফ খাঁ আজ লোক লোচনের অন্তরালে মাতৃক্রোড়ে নিহীত; ঈপ্সিতধনে ধনবান হইয়া সাধক আজ মর্ত্ত-লীলা অবসান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি ভাতি সম্যগরূপে না হউক, এখনও ত্রিবেণী গ্রামকে তীর্থে পরিণত করিয়া চির উজ্জল করিয়া রাখিয়াছে। আর তাঁহার সেই প্রাণোন্মাদকারী গঙ্গাস্তোত্র এখনও সাধুভক্তের কণ্ঠোচ্চারিত হইয়া দিগ্‌দেশ মুখরিত করিতেছে। ধন্য ত্রিবেণীগ্রাম! যাহা একসময়ে পরমভক্ত দরাফ খাঁর ও মতিয়ার পদরেণু সমুজ্জল হইয়া আপন মাহাত্ম্য বিঘোষিত করিয়াছিল, যাহার দুর্লভ সঙ্গসুখ অনুভব করিবার জন্য তখন নানা দেশ হইতে কত শত ভক্ত আসিয়া এই গ্রামের শোভা বর্দ্ধন করিত, গঙ্গার পবিত্রসলিলে স্নান করিয়া জন্মজন্মান্তরের পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য দরাফের সহিত গাহিত—"সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং" ইত্যাদি। তারপর দরাফ গাজীর কুড়ুল এখনও বর্ত্তমান; তাঁহার আশ্চর্য্য কীর্ত্তি এখনও লোকের নয়ন ধাঁধিয়া অমরত্ব ঘোষণা করিতেছে। সাধক আজ নাই—তাই স্থানের সে শোভা সৌন্দর্য্য আর তেমন নয়ন মনোহর ভাবে লোকের চিত্ত বিভ্রম উপস্থিত করিতে পারে না; এককালে লোকে ত্রিবেণী তীর্থে আগমন করিয়া দরাফের দরগার মাটী স্পর্শ না করিলে আপনি পবিত্র হইলাম বলিয়া মনে করিত না। কর্ম্মকঠোর জীবনের অবসর লইয়া কত শত সাধু-ভক্ত একদিন দরাফের দরগার মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া মনপ্রাণ সুশীতল করিত; হায়! কাল প্রভাবে তাহার সে শোভা-সৌন্দর্য্য, প্রিয়দর্শন ভক্তের সে অতুলনীয় সুধাকণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীত আর শ্রোতার কর্ণে তেমন করিয়া অমৃতবর্ষণ করে না। ত্রিবেণী বন্দরের সেই কর্ম্মকোলাহলপূর্ণ ভীষণতাও

আর নাই ; হাটের সে আড়ম্বরও কোথায় তিরোহিত হইয়াছে। কেবল দরগার সেই ভগ্নস্তূপ অতীতের সাক্ষী স্বরূপ এখনও দণ্ডায়মান, মহাকালের মহাখেলা এখন আর কাহারও নয়নের তৃপ্তি সম্পাদন করিতে পারে না। অনেক সময় অনেক মহাত্মা ত্রিবেণীর দরাফখাঁর দরগা ও সতীবেহুলার ঘাট সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন। তজ্জন্য এখন তাহার কিছু কিছু নয়নগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বের সহিত তুলনায় ইহা কিছুই নহে, দেবমূর্ত্তি বিহীন মন্দিরের ন্যায় কেবল নয়নের দুঃখদায়ক। অদূরে সুবিস্তৃত প্রান্তর আপনার বিশালত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য শ্যাম শোভায় সুশোভিত রহিয়াছে, ত্রিবেণীর দুইকূলে চড়া পড়িয়া গিয়াছে, পবিত্র সলিল শুষ্ক হইয়া প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে। আর তাহার উপর দিয়া পাগ্‌লা বাতাস্ দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া হা হা হু হু শব্দে বহিয়া যাইতেছে।

সম্পূর্ণ